ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ।। ৪ ফাল্গুন, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

গুয়াহাটি হাইকোর্টের অভিমত

নিষ্পত্তি না হলে বাংলাদেশীদের জেলেই থাকতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অসমে সন্দেহভাজন বাংলাদেশীদের নিয়ে প্রশাসন ও রাজনৈতিক দল ও নেতাদের লুকোচুরি ধরে ফেলল গুয়াহাটি হাইকোর্ট। অনেক সময়ই দেখা যায়, যে সকল বাংলাদেশী ধরা পড়ছে তারা একবার জামিন পেলেই জনারণ্যে হারিয়ে যায়। আর ভারতবর্ষের পুলিশ (বিশেষত অসম এবং পশ্চিমবঙ্গ) পার হলেই জনারণ্যে উধাও হয়ে যায়। তাদের দেওয়া ঠিকানায় দেখা পাওয়া যায় না অথবা ঠিকানাটিই ভুয়ো।

গুয়াহাটি হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি বি কে শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ সাম্প্রতিক অতীতে বিদেশী সনাক্তকরণ আইনে ধৃতদের অনেকগুলি মামলায় পূর্বোক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন।

বিচারপতি বি কে শর্মা

“সন্দিগ্ধ বাংলাদেশীরা ধরা পড়ার পর সুযোগ পেলেই গা-ঢাকা দেয়। ....এই হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা বেশি করে ঘটছে ১৯৯৯ থেকেই। তারা বহাল তবিয়তে রাজ্যে বসবাস করছে, নির্বাচনে অবাধে ভোটও দিচ্ছে।”

তাদের আর পাকড়াও করতে পারেই না। তা সেটা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যাই হোক না কেন! গুয়াহাটি হাইকোর্ট এবার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে যে যতদিন না ধৃতদের বিরুদ্ধে চলা মামলার সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি হচ্ছে ততদিন তাদেরকে কারাগারেই আটক রাখতে হবে। অবশ্যই যে পর্যন্ত না তাদেরকে ভারতীয় অথবা অন্য কিছু ঘোষণা না করা হয়। গুয়াহাটি হাইকোর্ট বলেছে, সাম্প্রতিক অতীতে দেখা গেছে — সন্দিগ্ধ বাংলাদেশীরা ধরা পড়ার পর সুযোগ পেলেই গা-ঢাকা দেয়। সেজন্য হাইকোর্টই এই বিষয়ে রাজ্য পুলিশ এবং অসামরিক প্রশাসনকে এই প্রস্তাব দিয়েছে। বিগত কয়েকমাসে এধরনের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গেও আকছার ঘটতে দেখা গেছে। এমনকী অনুপ্রবেশকারীরাই নয়, বৈধ পথে আসা ভিসা-পাসপোর্টধারীরাও মেয়াদ সেজন্য শব্দ প্রয়োগ হচ্ছে অনুপ্রবেশকারী তথা বাংলাদেশীদের রক্ষা করছে 'ভ্যানিসিং অ্যাক্ট'। যা আদপে কোনও আইনই নয়। এই হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা বেশি করে ঘটছে ১৯৯৯ থেকেই। তারা বহাল তবিয়তে রাজ্যে বসবাস করছে, নির্বাচনে অবাধে ভোটও দিচ্ছে। একথা খোদ গুয়াহাটি হাইকোর্টের।

রাজ্যের পুলিশ মহানির্দেশকের একটি রিপোর্ট, যা রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর অনুমোদন করেছে — তাকে হাইকোর্ট 'অমনোযোগ সহকারে' লেখা বলে মন্তব্য করেছেন। সেখানে বাংলাদেশীকে পাকিস্তানী বলে ডি জি পি উল্লেখ করেছেন। মহামান্য গুয়াহাটি হাইকোর্টের মন্তব্য — এই যদি রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগের হাল হয়, তাহলে অসমে

(এরপর ৪ পাতায়)

নাগপুরে বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক

নির্বাচনে মোদীকেই সামনে রাখছে দল

গূঢ়পুরুষ ।। আসন্ন লোকসভার নির্বাচনে এবার 'উন্নয়নের দূত' নরেন্দ্র মোদীকে বিজেপি মহারাষ্ট্র ও গোয়ায় দলের প্রধান প্রচারকের দায়িত্ব দিয়েছে। এছাড়া তাঁর নিজ রাজ্য গুজরাত আছেই। নরেন্দ্র মোদীর উপর আস্থা রাখা থেকে একটা কথা স্পষ্ট যে বিজেপি সারা দেশে সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে। গুজরাতে মোদীর নেতৃত্বে যে অভূতপূর্ব সার্বিক উন্নয়ণ হয়েছে সারা ভারতে তার দ্বিতীয় নজির নেই। কোনও সন্দেহ নেই যে গুজরাত এখন দেশের উন্নয়নের রোল মডেল।

গুজরাতে ২০০৬ সালে কৃষিপণ্যের মোট উৎপাদন টাকার অঙ্কে ছিল ৯,০০০ কোটি। মাত্র দু'বছর পরে ২০০৮ সালে এই উৎপাদন মূল্য দাঁড়িয়েছে ৩৫,০০০ কোটি টাকায়। মোদী জানেন গ্রামীণ অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। চাষবাসের উন্নতি হলেই গ্রামের মানুষ উন্নয়নের অর্থটা কী বুঝতে পারবে। গুজরাতে চাষের প্রধান অন্তরায় জলের অভাব। এই অভাব মেটাতে এতকাল ভূগর্ভের জল ব্যবহার করা চলছিল। ফলে মাটির তলার জলস্তর কমতে কমতে একটা মহাপ্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে রাজ্যকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। মোদী এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে গুজরাতকে বাঁচাতে রাজ্যের ১৮,০০০ গ্রামে লক্ষাধিক ছোট ছোট জলাধার নির্মাণ করেছেন। এই জলাধারে বর্ষার সময় পাওয়া বৃষ্টির জল ধরে রাখা হয়। প্রতিটি গ্রামে একাধিক এইসব জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে গ্রামবাসীদের স্বেচ্ছা শ্রমদানে। অর্থাৎ জলাধার নির্মাণের জন্য

অর্থ ও কারিগরি সহায়তা দিয়েছে রাজ্য সরকার। গায়ে গতরে শ্রমদান করেছেন গ্রামের মেয়ে পুরুষ। সরকারি ঠিকাদার নয়, প্রকল্পের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গ্রামেরই সর্বসম্মতভাবে মনোনীত প্রতিনিধি ''গ্রাম মিত্র''-দের। নিট ফল, দক্ষতা ও দ্রুততার সঙ্গে লক্ষাধিক 'চেক্ ড্যাম'' বা বৃষ্টির জল ধরে রাখার জলাধার গড়ে উঠেছে গুজরাতের প্রতিটি গ্রামে। শুধু জল নয়, রাজ্যের ১৮,০০০ গ্রামে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থাও নরেন্দ্র মোদী করেছেন। সারা ভারতে গুজরাতই একমাত্র রাজ্য সেখানের মানুষ লোডশেডিং কথাটার মানে জানেন না। গুজরাতই একমাত্র রাজ্য যেখানে প্রতিটি গ্রামেই বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো বিদ্যুতের তার খাটাবার খুঁটি পুঁতেই বলা হয় না যে অমুক অমুক মৌজায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। গুজরাতের একজন চাষীকে অতীতে গভীর নলকূপ থেকে সেচের জল পেতে মাসে ৬০০ টাকা দিতে হতো। এখন বৃষ্টির জলের জলাধার থেকে জল পেতে দিতে হয় বছরে মাত্র ৩০০ টাকা। চাষীদের দেয় টাকা জমা থাকে গ্রামেরই পঞ্চায়েতের কাছে। চাষীদের উপার্জিত টাকা গচ্ছিত রাখার জন্য গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অসংখ্য শাখা খোলা হয়েছে। এই জমা টাকার অন্যতম শর্ত হিসাবে ব্যাঙ্ক বিনা গ্যারান্টিতে চাষের কাজে সহজ সুদে চাষীদের এখন কৃষি ঋণ দিচ্ছে। আর ঠিক এই কারণেই মাত্র দু'বছর গুজরাতে কৃষিপণ্য উৎপাদন মূল্য ৯,০০০ কোটি থেকে ৩৫,০০০ কোটি টাকা হয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর হাতে কোনও জাদুদন্ড নেই। তিনি জাদুকরও নন। তিনি উন্নয়নের পথটি গ্রামের মানুষকে দেখিয়েছেন। তাঁদের আত্মনির্ভর হতে প্রয়োজনীয় সাহায্যটুকু যথাসময়ে করেছেন। আসল কাজটা গ্রামের

(এরপর ১৬ পাতায়)

রোগীর নাম রেজ্জাক হলে মুখ্যমন্ত্রী খোঁজ নেন, সুকুমার-দের কে দেখবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। লোকসভা ভোটের বাদ্যি বাজতেই রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মুসলিম ভোট পেতে জোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে। সিপিএম এব্যাপারে এতটাই নির্লজ্জ যে দুর্ঘটনায় আহত মুসলমান চালককে নিয়েও রাজনীতি করতে পিছপা হচ্ছে না। সম্প্রতি হুগলীতে এক পথ দুর্ঘটনায় সেখ রেজ্জাক নামে এক যুবকের বুকে লোহার রড ঢুকে যায়। কলকাতা মেডিকেল কলেজের ডাক্তাররা দীর্ঘ অপারেশন করে তাকে সারিয়ে তোলেন।

ডাক্তারদের এই অপারেশনের জন্য বাহবা প্রাপ্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু যেহেতু রোগীর নাম রেজ্জাক তাই মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এনিয়ে রাজনীতির ঘৃণ্য খেলায় নামলেন। অপারেশনের পরদিনই ডাক্তারদের অভিনন্দন জানালেন। এমনকী বাড়ি ফেরার আগে মহাকরণে নিজের চেম্বারে রেজ্জাকের সঙ্গে দেখাও করলেন। উদ্দেশ্য একটাই, সংবাদ মাধ্যমের সামনে তুলে ধরা যে, এই মুখ্যমন্ত্রী মুসলিমদের জন্য কত দরদী। এমন এক সাধারণ মুসলিম যুবকের জন্যও তাঁর প্রাণ কাঁদে। অথচ এই ঘটনার দিন কয়েকের মধ্যেই সুকুমার মন্ডল নামে আর এক রোগী নীলরতন সরকার হাসপাতালে আসেন। তাঁরও শরীরে ফুসফুস ফুটো করে আট ফুট লম্বা রড ঢুকে যায়। এন

রেজ্জাক

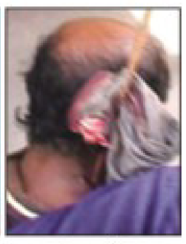
সুকুমার

আর এস হাসপাতালের ডাক্তাররা তাঁর অপারেশন করেন। সুকুমার এখনও হাসপাতালে রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু এখনও ওই চিকিৎসক দলকে অভিনন্দনও জানাননি, দেখা করতেও চাননি।

পি জি হাসপাতালের ডাক্তাররাও মেডিকেল কলেজের রেজ্জাকের অপারেশনের ঘটনা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। তাঁদের দাবি, পিজিতে বছর চারেক আগেই এমন অপারেশন হয়েছিল। কিন্তু রোগীর নাম 'রেজ্জাক' ছিল না বলেই বোধ হয় এত হইচই হয়নি।

মুসলিম তোষণের আরও একটি উদাহরণ সম্প্রতি দেখা গেল বিষ্ণুপুর-পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে ঘিরে। ১ লক্ষ ৪০ হাজার ভোটারের মাত্র ২০ হাজার মুসলিম হলেও, সিপিএম এবং কংগ্রেস এখানে মুসলিম প্রার্থী দিয়েছে। ভাবুন তো এন্টালিতে কি হিন্দু প্রার্থী করবে?

দেশের নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের মুখে

ফেরৎ যাচ্ছে প্রতিরক্ষার টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সমরাস্ত্র কেনা বাবদ বরাদ্দের ১৬ হাজার কোটি টাকা খরচই করে উঠতে পারেনি। পাঁচ বছরেও খরচ করতে না পারার জন্য উদ্বৃত্ত অর্থ ফেরৎ দিতে হয়েছে। এদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যখন ভিতরে-বাইরে চ্যালেঞ্জের মুখে তখন কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারের এই উদাসীনতা উদ্বেগের কারণ। সর্বত্রই আধুনিকীকরণের জন্য আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও যোগাযোগের উপকরণ কেনার কথা উঠলেও তা কার্যকর করা হয়নি। ওয়াকিবহাল মহল এই অক্ষমতার জন্য কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে উদ্বৃত্ত অর্থ ৫০০০ কোটি টাকা, ২০০৫-০৬ এ ১৩০০ কোটি টাকা, ২০০৬-০৭-এ ৩০০০ কোটি টাকা আর ২০০৭-০৮-এ উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ ৪,২০০ কোটি টাকা। এমনকী চালু-বিত্ত বছরেও ৪০০ কোটি টাকা ফেরৎ দিচ্ছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

এ কে অ্যান্টনী

এদিকে সরকারের পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে যে, সেনাবাহিনীকে সর্বাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করা হবে। অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করতেও অপারগ। গত বছরের নভেম্বর-এ মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!

SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।

যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।

যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –

Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221

SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

আদালতের রায়ের পর

দেরি হবে না রামমন্দির নির্মাণেঃ শ্রীসুদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আগামী দু-আড়াই বছরের মধ্যে রামমন্দির নির্মাণ হয়ে যাবে। তবে আদালতের রায় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মোটামুটি নিশ্চিত, রায় রামমন্দিরের পক্ষেই মিলবে। রায় প্রকাশের পর মন্দির

নির্মাণে খুব বেশি সময় লাগবে না। গত ৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় অসমের শিলচরের গান্ধীভবন মিলনায়তনে আয়োজিত নাগরিক সভায় একথা বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শন।

এদিন তাঁর ভাষণে শ্রীসুদর্শন চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন পাশ্চাত্য জীবন দর্শন ও মানবিক মূল্যবোধের। তিনি বলেন, পাশ্চাত্য দর্শনের চারটি মূলকথা - এক, অস্তিত্বের জন্য সংঘর্ষ;দুই, যার যত শক্তি তিনি তত বাঁচবেন; তিন, প্রকৃতির শোষণ এবং চার, ব্যক্তিগত অধিকার। কিন্তু ভারতীয় জীবন দর্শন ঠিক এর উল্টো কথাই বলে। এখানে সংঘর্ষের কোনও স্থান নেই। প্রেম-প্রীতি দিয়েই নিজের অস্তিত্বকে মহান করে তোলা সম্ভব। ফলে যার যত শক্তি, তিনি তত বাঁচবেন, তা মেনে নেওয়া যায় না। আমাদের বিশ্বাস, সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে বাঁচতে হবে। এছাড়া নিজেদের জন্যই প্রকৃতিকে অনুকূল রাখতে হবে। সবশেষে, ভারতীয় দর্শনে ব্যক্তিগত অধিকারের কোনও স্থান নেই। ভারতীয়রা মনে করেন, আমরা যেহেতু পৃথিবীতে বেঁচে আছি, তাই আমাদের কিছু কর্তব্য রয়েছে, অধিকারের কোনও বিষয় নেই।

তিনি বলেন, পাশ্চাত্য জীবনদৃষ্টি আঁকড়ে রাখার দরুণই মুসলমান ও খৃস্টানরা সংঘর্ষে জড়িয়ে থাকে। মুসলমানদের দাবি সকলকে মুসলমান হতে হবে, খৃস্টানরা চায় সবাই তাদের ধর্ম পালন করুক। কিন্তু হিন্দুদের মূল কথা হল — একাত্মতা (আত্মবৎ সর্বভূতেষু)। এরপরও আমাদের দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি পাশ্চাত্য চিন্তায় পরিচালিত হয় বলে শ্রীসুদর্শন আক্ষেপ করেন।

রাজনীতিকদের একহাত নিয়ে তিনি বলেন, তারাই জাতি-ভাষা-বর্ণ ইত্যাদিতে বিভেদ উসকে দেয়। রাজনৈতিক দলগুলোই বিভেদ সৃষ্টি করে। ভারতের খৃস্টান ও মুসলমানরা আদৌ বহিরাগত নয়। বরং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছে। এদেরকে সংখ্যালঘু হিসাবেই চিহ্নিত করা হয়েছে এবং হচ্ছে — এবং তা করা হচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে। প্রসঙ্গত তিনি পারসি ও ইহুদিদের প্রশংসা করেন। এই হিসাবে তিনি ভারতীয় মুসলমান ও খৃস্টানকে নিজেদের সংখ্যালঘু হিসেবে না ভাবতে বলে তাঁর আহ্বান, সবাই এক হয়ে রাষ্ট্রীয় ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে তিনি কড়া সমালোচনা করে বলেন, সংসদীয় রাজনীতির ফায়দা নিতে তৎপর এদেশের রাজনীতিকরা। মাত্র ২০ শতাংশ জনমত হাসিল করেও ক্ষমতার শীর্ষে বসা সম্ভব ভোট বিভাজনে।

এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে ছিলেন সঙ্ঘের দক্ষিণ অসমের প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিমল নাথ চৌধুরী ও দিব্যেন্দু শেখর ভট্টাচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ক্ষৌণিশ চক্রবর্তী।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা

আদবানীর ছয়টি প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গত ৮ ফেব্রুয়ারি নাগপুরে বিজেপির জাতীয় কর্মপরিষদের সমাপ্তি অধিবেশনে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে ছ'য়টি প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা এল কে আদবানী। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ও ইউপিএ-র চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীর কাছে তাঁর জিজ্ঞাসা —

✦ মুম্বাই-এ সন্ত্রাসবাদী হামলার পর কেন তদন্ত কমিশন গঠন করা হল না?

✦ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতার জন্য শিবরাজ পাতিলকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলেও, গত সাড়ে চার বছর কার বদান্যতায় তিনি ওই পদে বহাল ছিলেন?

✦ কেন এখনও পর্যন্ত নরম কূটনৈতিক চাপ (যেমন বাণিজ্যিক সম্পর্ক) সৃষ্টি করা হল না, যদিও বলা হচ্ছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সব বিকল্প খোলা রাখা হয়েছে।

✦ প্রধানমন্ত্রী কি স্বীকার করবেন যে গত চার বছরে বিশেষ সন্ত্রাস বিরোধী আইন তৈরি না করা তাঁর ভুল হয়েছে? পোটা আইনের বিরোধিতা করা ভুল হয়েছে বলে সোনিয়া গান্ধী কি স্বীকার করবেন?

✦ সংসদ ভবন আক্রমণের অপরাধী সর্বোচ্চ আদালতে দন্ডপ্রাপ্ত আফজল গুরুকে ফাঁসি দেওয়া হল না কেন?

✦ কেন কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের রায় উপেক্ষা করে চলেছে?

এই সময়

কন্যারাই প্রিয়

কর্ণাটকে এখন কন্যারাই খুব প্রিয়। অন্তত রাজনীতির ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষকরা এটাই লক্ষ্য করছেন। এইসব কন্যারা রাজনৈতিক অঙ্গনে নিজেদের পারিবারিক ধারা বজায় রাখছেন। যেমন, রামকৃষ্ণ হেগড়ের কন্যা মমতা নিচানি গত বছর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এবছর এইচ ডি দেবগৌড়ার পুত্রবধূ অনিতা কুমারস্বামী মধুগিরি কেন্দ্রে নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণার কন্যা আসন্ন নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থী হতে চলেছেন।

মনঃসংযোগ

সম্প্রতি ভেঙ্কাইয়া নাইডুর মতো প্রবীণ নেতার পরামর্শে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান নিজের মন্ত্রীসভার সদস্যদের মনঃসংযোগ পরীক্ষার জন্য পাঁচমুড়িতে দু'দিনের এক কর্মশালার আয়োজন করেন। সেখানে একটি লাইন শুনে অন্যকে তা বলতে বলা হয়েছিল। কথাটা ছিল — 'তালিবানদের বিরুদ্ধে নরমনীতির জন্য পাকিস্তানকে সতর্ক করলেন ওবামা।' এই লাইনটি শেষ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় — ওবামা সতর্কিত (Obama was warned)।

নতুন সন্ত্রাস

একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ৯০ হাজার কোটি টাকা অথবা ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমান লেনদেনের ১৫ শতাংশই হচ্ছে জাল নোট। পাকিস্তানের আই এস আই-এই জাল নোট এদেশে চোরাপথে পাঠাচ্ছে। এদেশে গত কয়েক বছরে যে জাল নোট ধরা পড়েছে, তার হিসাবটা হল এইরকম — ২০০১-এ ৫.৩ কোটি, ২০০২-এ ৬.৬ কোটি, ২০০৩-এ ৫.৭ কোটি, ২০০৪-এ ৭ কোটি, ২০০৫-এ ৬.৯ কোটি, ২০০৬-এ ৮.৪ কোটি এবং ২০০৭-এ ১০ কোটি টাকা। এছাড়া বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে ৫ কোটি, ৪৯ লক্ষ ৯১ হাজার টাকার জাল নোট বাজেয়াপ্ত করেছে।

ভোটের লুঠ

এমনিতেই এরাজ্যের সরকারি ব্যবস্থা ঢিলেঢালা, তার উপর সরকারিভাবে অর্থ সাহায্যের ব্যাপার হলে তো কথাই নেই, প্রাপকের হাল হয় বেহাল। কিন্তু এবার তা হবে না। আবেদন করা মাত্রই মিলবে ঋণ। দেরি হলে খুব বেশি এক মাস। এমনকী আবেদনকারী মা বা স্ত্রী'র নামেও আবেদন করতে পারেন। ঋণের পরিমাণও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে হ্যাঁ, এই ঋণ পাবেন শুধু সংখ্যালঘুরা। স্পষ্ট করে বললে মুসলিমরা। ভোটের আগে সংখ্যালঘুদের জন্য এমন হরিলুঠের ব্যবস্থা করেছে রাজ্যের বাম সরকার। শুধু তাই নয়, তাদের জন্য অন্যান্য সুযোগ সুবিধাসহ আবাসন দেবার কথাও ঘোষণা করেছে বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্যের সরকার।

বিচারের বেদী

মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা বিশেষত আইনি সমস্যাকে সমাধানের রাস্তা দেখাতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন দেশের প্রথম মহিলা আই পি এস অফিসার কিরণ বেদী। সম্প্রতি কলকাতায় একটি হাসপাতালে এসে তিনি বলেন, মহিলাদের পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত সমস্যারও সমাধানের জন্য দু-পক্ষকে সামনা-সামনি ডেকে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যমে সমাধানের এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে চান। এর ফলে সামাজিক সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। প্রচার মাধ্যমে এর সম্প্রচারের জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্যের ব্যাপারেও তিনি আশাবাদী বলে জানান।

ক্ষয়িষ্ণু মালদ্বীপ

প্রায় তিন দশক ধরে নিজের সৌন্দর্যের অঙ্গনে টেনে এনেছে লক্ষ লক্ষ পর্যটককে। নিজের শান্ত অথচ দুষ্টু-মিষ্টি সৌন্দর্যে মুগ্ধ করেছে আগন্তুকদের। কিন্তু আগামী কয়েক দশকের মধ্যে সমস্ত কিছু হারিয়ে যাবে। চিরকালের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে — এমনই আভাস দিয়েছেন জাতিসঙ্ঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণা বিভাগ। হ্যাঁ, পর্যটকদের প্রাণ মালদ্বীপ নাকি এমনই এক সংকটে। সমুদ্রের জলস্তর যেভাবে বাড়ছে তাতে হারিয়ে যাবে মালদ্বীপের ১১৯২ টি দ্বীপ।

বিপজ্জনক সত্য

হোয়াইট হাউসের চাপে শেষ পর্যন্ত মাদ্রাসা সংক্রান্ত সত্য উদ্‌ঘাটনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করলো পাক-সরকার। পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী মীর হাজার খান বিজরানির তথ্য অনুসারে পাকিস্তানে ১৫ হাজার ১৪৮ টি স্বীকৃত মাদ্রাসা রয়েছে। এই রিপোর্টেই চক্ষু ছানাবড়া হোয়াইট হাউসের। তার উপর রাজ্য সরকারগুলির বিশেষ স্বীকৃত মাদ্রাসা রয়েছে,যার সংখ্যা হাজারের উপর। এরপরও রয়েছে বেসরকারি মাদ্রাসা। সব মিলিয়ে পাকিস্তান যে জঙ্গি তৈরির কারখানা, সে ব্যাপারে প্রথমেই তথ্যমূলকভাবে যাচাই করে নেন ওবামা প্রশাসন।

বিস্ময়কর

এমনিতেই আমেরিকা বিরোধী বলে খ্যাত জাপানীরা। তার উপর ইংরেজির প্রতিও আসক্তি কম জাপানীদের। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক হোসেন ওবামার শপথ ভাষণটির ইংরেজি প্রতিলিপি এক সপ্তাহের মধ্যে জাপানে চার লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে। বিশ্বের মধ্যে এ এক বিস্ময়কর ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন আন্তর্জাতিক কূটনীতিবিদরা। বিস্ময় প্রকাশ করেছেন খোদ ওবামাও।

দৃঢ় পদক্ষেপ

দায়িত্ব গ্রহণের স্বল্প সময়ের মধ্যেই তৎপর হয়ে উঠলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুসারে পেন্টাগনের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে ওবামা আল কায়েদা, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের গতিবিধি সংক্রান্ত ফাইল দেখেন। জরুরিকালীন ভিত্তিতে পাক-আফগানের ১৩৬টি শিবিরের ওপর হামলা চালাতে ইরাক থেকে ৬০ হাজার মার্কিন সেনাকে স্থানান্তরের সিদ্ধান্তও নেন তিনি। এ ব্যাপারে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লু বুশের সঙ্গে আলোচনা করার পরই তিনি সক্রিয় হবেন বলে জানা গেছে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ পশ্চাতে

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গ যেন ক্রমশ নৈরাজ্যের রাজ্যে পরিণত হইতেছে। আইন আছে, সেই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাইবার উপায়েরও অভাব নাই। আদালত আছে, তাহার রায় কার্যকর করিবার গরজ নাই। পুলিশ-প্রশাসন আছে, কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে নহে, কর্তার ইচ্ছায় তাহারা কর্ম করিয়া থাকেন। সরকারও আছে এবং দীর্ঘ বত্রিশ বছর তাহারা একটানা শাসনও করিতেছে, কিন্তু উন্নয়ণের নামে দলীয় স্বার্থসিদ্ধি তেই বেশি তৎপর। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি একজোট হইয়া সরকারের স্বৈরাচারী কাজকর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার পরিবর্তে পারস্পরিক দোষারোপেই ব্যস্ত, ছাত্রশক্তি নিষ্ক্রিয়, সুশীল সমাজ উদাসীন এবং সাধারণ মানুষ সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত। এক নজরে ইহাই হইল সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গের চালচিত্র।

গত কয়েক বছর ধরিয়া সিঙ্গুর সংবাদের শিরোনামে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গুরের জমি লইয়া বিরোধী দলনেত্রীকে এক প্রকার চ্যালেঞ্জ ছুড়িয়া দিয়েছেন। পাল্টা জবাবে এই ইস্যুতে শেষ দেখিয়া ছাড়িবার হুমকি দিয়াছেন বিরোধী তৃণমূল নেত্রী। ফল — সিঙ্গুর লইয়া আবার সম্মুখ সমর। ঘটনা হইল, সিঙ্গুরের জমিতে কারখানা হইবে বলিয়া মুখ্যমন্ত্রী যে দাবি করিয়াছেন তাহা কতটা আন্তরিক? ডানলপের মতো ঘটনা সিঙ্গুরেও ঘটিবে না তাহার গ্যারান্টি কোথায়? সেখানে কারখানার জন্য জমি লইয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। শিল্পই যদি হইবে তাহা হইলে ডানলপ বন্ধ হইল কেন? এই বামফ্রন্টের বত্রিশ বছরের শাসনে ৫৫ হাজার বড় কারখানা, আর ১ লাখ ২৫ হাজার ছোট কারখানার দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৫ লক্ষ শ্রমিক কর্মচ্যুত হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের বহু ছেলেমেয়েকে রুটি-রুজির জন্য ভিন রাজ্যে যাইতে হইয়াছে। 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ' — পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের এই স্লোগান এখন আম জনতার কাছে 'দুর্নীতি আমাদের ভিত্তি, অন্ধকার আমাদের ভবিষ্যৎ' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি হোটেল হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল-এ সিপিএম-এর শ্রমিক ফ্রন্ট সিটু-র উপদ্রব এমন পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছে যে তাহারা আদালতের নির্দেশকেও পাত্তা দিতে রাজী নয়। এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী—যাহারা শিল্পায়নের খোয়াব দেখিতেছেন, তাঁহারা কি 'হোটেল' নামক শিল্পটিকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিবেন?

পুলিশ এবং গুন্ডারা মিলিয়া নন্দীগ্রামে যে ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছে বুদ্ধ-বিমান তাহা নিরাময় কবিতে পারিবেন না। আজ সবাই দেখিতেছেন, সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রাম মিলাইয়া এমন হাল হইয়াছে যে দেশে-বিদেশে সিপিএমের মুখ দেখাইবার উপায় রইলো না। সম্প্রতি সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সহিত আরও একটি নাম যুক্ত হইয়াছে — লালগড়। দীর্ঘদিন ধরিয়া লালগড় ও সন্নিহিত জঙ্গলমহলের মানুষ অবহেলা ও লাঞ্ছনার শিকার হইয়াছেন। শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকা পুলিশ বাহিনীর হাতে দিনের পর দিন লালগড়ে নিরীহ জনজাতি সমাজের মানুষ অত্যাচারিত হইয়াছেন। মহিলারাও রেহাই পাননি। লাগামহীন বঞ্চ নায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন সেখানকার মানুষ। জনরোষ এমন পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছে যে, পুলিশ সেখানে ঢুকিতে পর্যন্ত ভয় পাইতেছে। সিপিএম এক এক সময়ে এক এক রকম ছলাকলার আশ্রয় নেয়। কখনও পুলিশকে সক্রিয় করা, কখনও নিষ্ক্রিয় রাখা, কখনও বা ক্যাডার-হার্মাদ লেলাইয়া দেওয়া। এইবারের কৌশল ছিল পুলিশকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রাখা। বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে সরকারের আইন রক্ষকরাই 'অপরাগ' বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। যে পুলিশ বাহিনী 'জেড ক্যাটাগরি'র আওতাভুক্ত বিরোধী নেত্রীকে লালগড়ে যাইবার জন্য নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ, তাহারা সাধারণ মানুষকে কীভাবে নিরাপত্তা দিবে? লালগড়ে আইনশৃঙ্খলা যে একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে তাহা মুখ্যসচিবের কথাতেও পরিস্কার।

শুধু দক্ষিণবঙ্গেই নয়, বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গেও আইন শৃঙ্খলার অবনতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। যে আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলিয়া সিপিএম দেশ ভাগের পক্ষে ওকালতি করিয়াছিল, সেই একই নীতির দোহাই দিয়া সুভাষ ঘিসিং বা বিমল গুরুং-এর গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ড-এর দাবি জানাইয়া আসিতেছে। এই দাবির জেরে পাহাড়ে মাঝে-মধ্যেই অশান্ত হইয়া উঠিতেছে। শুধু তাহাই নয়, এই দাবির আওতায় তরাই ও ডুয়ার্সকেও মোর্চা আনিতে চায়। মোর্চার এই দাবির বিরুদ্ধে শুধু সোচ্চার নয়, তরাই ও ডুয়ার্সের জনজতি সমাজ প্রতিবাদ জানাইতে 'আদিবাসী বিকাশ পরিষদ'-এর ব্যানারে পথে নামিয়া পড়িয়াছে। পরিষদের চার সমর্থককে পুলিশ আচমকা গ্রেপ্তার করায় নাগরাকাটা, বানারহাট, এথেলবাড়ি, বিন্নাগুড়ি, বীরপাড়া সহ বিভিন্ন জায়গায় দলে দলে জনজাতি পুরষ ও মহিলা হাতে তীর-ধনুক, বল্লমসহ পথ অবরোধ করে। নাগরাকাটা থানায় আগুন ধরাইয়া দেয়। পুলিশ গুলি চালায়। সব মিলিয়া পাহাড় ও সংশ্লিষ্ট তরাই ও ডুয়ার্স অগ্নিগর্ভ। আবার 'গ্রেটার কোচবিহার'-এর দাবিতে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির একাংশ মাঝে মধ্যেই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। গত বছর কোচবিহারের দিনহাটায় সাত দফা দাবিতে আইন অমান্য কর্মসূচী বানচাল করিতে পুলিশের গুলি চালনায় পাঁচ কর্মীর মৃত্যুকে বামফ্রন্ট সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া শরিক দল ফরোয়ার্ড ব্লক ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে।

এই যে নন্দীগ্রাম হইতে লালগড়, সিঙ্গুর হইতে নাগরাকাটা — রাজ্যের সর্বত্রই একটা অশান্তির বাতাবরণ বিরাজ করিতেছে ইহার মূলে রাজ্যের সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট। তাহাদের অদূরদর্শী নীতি ও কৌশলী কার্যকলাপই রাজ্যকে এইরকম নৈরাজ্যের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। সরকারের শীর্ষ মহলেই কথার সহিত কাজের কোনও সঙ্গতি নাই। শাসকদলের এই দ্বিচারিতায় রাজ্যপাল বা আদালতের মতো সাংবিধানিক পদ বা প্রতিষ্ঠানগুলিও কালিমালিপ্ত হইতেছে। পরিণামে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ পিছনের সারিতে চলিয়া যাইতেছে।

শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকতে জঙ্গিদের ব্যবহার করছে পাকিস্তান

তুতিউর রহমান পাটিকর

ইসলামি সন্ত্রাসের ধাত্রীভূমি পাকিস্তানে কট্টর মৌলবাদী জেহাদি গোষ্ঠী এবং বিশ্ব ত্রাস সন্ত্রাসীরা যে দীর্ঘদিন ধরে জামাই আদরে প্রতিপালিত হচ্ছে সেটা এখন গোটা বিশ্বের সামনে প্রমাণিত। মুম্বাই কাণ্ডের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এবং ধৃত পাক জঙ্গি আজমল কাসভের পাক নাগরিকত্বের অকাট্য প্রমাণসহ পাকিস্তানী সন্ত্রাসীদের ভারত-বিদ্বেষী কার্যকলাপ সম্পর্কে কাসবের স্বীকারোক্তির সত্যতা বিশ্ববাসীকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, পাকিস্তান নামক ভূখণ্ডটিই সন্ত্রাসবাদের সূতিকাগার। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও মেনে নিয়েছে বিশ্বের ভয়ঙ্কর জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি পাক -ভূখণ্ডে নিরাপদে আশ্রিত। ইসলামি সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা ভারতের অভিযোগসমূহ যে মোটেই অমূলক নয়, আমেরিকা সরাসরি অভিযোগ করেছে। যদিও পাক সরকার এ কথা কোনও অবস্থায় স্বীকার করতে চাইছে না। জঙ্গিপনায় মদতদানের যাবতীয় অভিযোগকে নস্যাৎ করে লাগাতার মিথ্যার বেসাতি চালিয়ে যাচ্ছে ইসলামাবাদ। তবে বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে এটাও একটা সান্ত্বনা যে, পাকিস্তানিদের কোনও কথাই আজ আর বিশ্বাস করতে পারছে না সন্ত্রাস-বিরোধী রাষ্ট্রগুলি। মুম্বাই হামলার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে বিশ্বের চোখে পাকিস্তানের প্রকৃত স্বরূপ আরও বেশি করে প্রকটিত হচ্ছে। পাকিস্তান সরকার নিজের চাল-চলন দিয়ে ইতিমধ্যে প্রমাণিত করে দিয়েছে যে তারা কতটুকু মিথ্যাচারে লিপ্ত। পাকিস্তান কোনও অবস্থায় সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করতে চায় না। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে নাশকতাবাদীদের ঠেলে পাঠিয়ে চোরাগোপ্তা হামলার নিকৃষ্ট স্পর্ধা দেখাতে দিচ্ছে। এমনকী পাকিস্তানের প্রাক্তন সামরিক শাসক পারভেজ মুশারফও আমেরিকায় প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন সে দেশের ইসলামি সংগঠনগুলির ছত্রছায়ায় পুরিপুষ্ট হচ্ছে আল কায়দার মতো ভয়ঙ্কর জঙ্গিগোষ্ঠী। শ্যাম আর কুল বজায় রাখতে গিয়ে মুশারফ বিচক্ষণ কূটনীতিকের মতো মন্তব্য করে বলেছেন, ইসলামি জঙ্গিরা পাক ভূখণ্ডে স্থায়ী আস্তানা গড়লেও, পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের ধাত্রীভূমি নয়। আফগানিস্তানই মূলত জঙ্গিদের মূল আবাসভূমি। আল কায়দার আশ্রয়দান নিয়ে মুশারফ মুখ খুললেও তার দেশের মদতপুষ্ট ভারত-বিদ্বেষী জঙ্গিগোষ্ঠীর ব্যাপারে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি তিনি। কারণ ক্ষমতার কুর্সিকে শক্ত করার নিমিত্তে মুশারফ তাঁর শাসনামলে ভারত-বিরোধী জঙ্গিদের ব্যবহার করেননি। তার পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ক্ষমতালিপ্সু সামরিক একনায়ক

> **"আমাদের কাছে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে পাক ইসলামি জঙ্গিরা ভারতবর্ষে ইসলামি শাসন কায়েম করার উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মীয় জেহাদ চালিয়ে গেছে। তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম, জঙ্গিরা ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে এ দেশের বুকে নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই জানতে ইচ্ছে করে যে, এ দেশে বংশানুক্রমিকভাবে যেসব মুসলমান বসবাস করছেন তারা কি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী নন। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাধিক্য রাষ্ট্র এই ভারতবর্ষের কয়েক কোটি মুসলমানরা কি অমুসলিম হয়ে পড়েছেন যে তাদের পরিত্রাণের জন্য ভারতে ইসলামি শাসন জরুরি।"**

সে ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত বিশ্ব সম্প্রদায়। সন্ত্রাসবাদ নিয়ে পাক সরকারের অনভিপ্রেত আচরণে শুধু যে ভারতবর্ষ বিব্রত তা নয়, বিশ্বের অন্যান্য বহু দেশও পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের নাশকতার বলি হচ্ছে। তাই পাকিস্তানকে নিয়ে বিশ্বের ধারণা ক্রমশ পাল্টাচ্ছে। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রকৃত স্বরূপ ধীরে ধীরে প্রকটিত হচ্ছে। বিশ্বের প্রতিটি সন্ত্রাস জর্জর দেশগুলির কাছে ক্রমাগত কোণঠাসা হয়ে পড়ছে পাকিস্তান। সন্ত্রাসবাদ নিয়ে পাকিস্তান যে এতদিন চাতুর্যের সঙ্গে লাগাতার মিথ্যাচার চালিয়ে বিশ্বকে বোকা বানানোর কূটচাল চালিয়ে গেছে, তা এখন উপলব্ধি করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও। আমেরিকার প্রাক্তন ভাইস্ প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি কোনও রাখঢাক না করেই স্বীকার করে নিয়েছেন বিশ্ব ত্রাস জঙ্গিরা পাকিস্তানের মাটিতে নিরাপদে আশ্রিত রয়েছে। সে দেশের ক্ষমতাসীনদের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় আল কায়দার মতো দুর্ধর্ষ জঙ্গিরা পাকিস্তানকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিয়েছে। সি এন এন-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, আফগানিস্তানের বেশিরভাগ অংশ থেকে আল কায়দাকে তাড়ানো সম্ভব হলেও, বিতাড়িত জঙ্গিরা পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানী শাসকরা এসব জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে পূর্ণ মদত জুগিয়ে যাচ্ছে বলে পারলেও সত্য স্বীকারে সাহস নেই পাকিস্তানের। তাই একটি সত্যকে আড়াল করতে হাজারো মিথ্যার আশ্রয় নিতে গিয়ে প্রকৃত সত্যই প্রকারান্তরে প্রকাশ করে দিচ্ছে পাকিস্তান। ফলে ক্রমশ ফাঁস হয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানের যাবতীয় গোপন কারসাজি। তাই এখন কারও বুঝতে বাকি নেই যে এতদিন ধরে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করে আসছে তা মোটেই অমূলক নয়। খোদ আমেরিকাও উপলব্ধি করতে পারছে, সন্ত্রাস নির্মূলের নামে পাকিস্তান আমেরিকার সঙ্গে এতদিন চতুরভাবে মিথ্যাচারিতা চালিয়ে এসেছে। দু'দেশের রাজনৈতিক পালাবদলে এই সত্যকে আরও বেশি করে উপলব্ধি করতে পারছেন মার্কিনরা। ন্যস্ত স্বার্থে যা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে পারেননি তথাকথিত সন্ত্রাস নির্মূলের মসীহা জর্জ বুশ। কারণ ক্ষমতায় থাকাকালীন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বুশ পাকিস্তানকে কায়েমি স্বার্থে ব্যবহার করেছেন, যার জন্য পাকিস্তানের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকা সত্ত্বেও, বুশ নিজের গায়ে থুথু পড়ার আশঙ্কায় সরাসরি মুখ খুলতে পারেননি। এই সুযোগে পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে ধোয়া তুলসিপাতা সাজাতে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে মিথ্যাচার চালিয়ে যান মসনদে আসীন যুধিষ্ঠিররা। কিন্তু সত্য যে বেশি দিন গোপন থাকে না বর্তমান পরিস্থিতি সেটা প্রমাণ করে পারভেজ মুশাররফ একাধিকবার ভারতের বিরুদ্ধে ইসলামি জঙ্গিদের লেলিয়ে দিয়ে এই দেশকে ক্ষতবিক্ষত করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। পাকিস্তানের ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হয়ে পাক-জঙ্গিপনা নিয়ে আজ আমেরিকার কাছে যে কথা খোলসা করে বলছেন মুশারফ তা ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরে বলে আসছে। তাই মন্থরার কথা শুনে বিশ্ব অবাক হলেও, ভারতবাসী মোটেই বিচলিত নন। কারণ পাক-জঙ্গিপনায় গত কয়েক দশক ধরে জর্জরিত ভারতবর্ষ। রক্তের হোলি খেলায় অভ্যস্ত অধিকাংশ পাকিস্তানী ভারতের সঙ্গে শত্রুতা বজায় রাখতে আগ্রহী। সেই গোঁড়াপন্থী ধর্মান্ধদের সমর্থন আদায় করতে সেদেশের মসনদে যারাই আসীন হয়, তারাই ভারতকে অশান্ত করার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে। আর এই পরিকল্পিত ছকের বাস্তবায়নে ইসলামি জঙ্গিদের কাজে লাগানো হয়। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের পর থেকে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের এহেন নিকৃষ্ট কূটচাল অব্যাহত। কিন্তু ইঁটের বদলে পাটকেল ছোঁড়ার যাবতীয় শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষ সে দেশের বিরুদ্ধে পাল্টা চাল দিতে চায়নি কোনও দিন। সহিষ্ণুতার মন্ত্রে উজ্জীবিত মুনি-ঋষিদের দেশ ভারত বরাবরই ধৈর্য সহকারে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে। অথচ ইচ্ছে করলে পাকিস্তানের মতো দেশকে

(এরপর ৪ পাতায়)

ভামাশাহ সেবা সম্মান অনুষ্ঠান

প্রত্যেক প্রজন্মেই ভামাশাহ-র প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। নতুন প্রজন্মের কাছে জীবনকে অনুসরণীয় করে তোলার মধ্য দিয়েই জীবনের সার্থকতা বলে উল্লেখ করলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ডঃ সরলা বিড়লা। গত ৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতার "ভামাশাহ সেবা সম্মান এবং স্মারিকা লোকার্পণ সমারোহ" অনুষ্ঠানে ভামাশাহ সেবা সম্মান গ্রহণ করতে এসে তিনি এই মন্তব্য করেন।

বসন্ত বিড়লার হাতে মানপত্র তুলে দিচ্ছেন গুলাব কোঠারি।

তিনি আরও বলেন, আজকের যুগে যথার্থ সেবক পাওয়া দুর্লভ। এমন এক সময়ে যুগান্তকারী ভামাশাহের মতো এক উদার হৃদয় সম্পন্ন সেবকের তথা দানবীরের নামে পুরস্কার গ্রহণ সত্যিই জীবনের এক বড় প্রাপ্তি। উল্লেখ্য, বণিক ভামাশাহ স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য মহারাণা প্রতাপকে নিজের অর্জিত ধন-সম্পদ সমর্পণ করেছিলেন।

এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন বিশিষ্ট সমাজসেবী যুগল কিশোর জৈথলিয়া। তারপর বিড়লা দম্পতির মধ্যে বসন্ত বিড়লাকে মানপত্র প্রদান করেন রাজস্থান পত্রিকার সম্পাদক গুলাব কোঠারি। শাল এবং অন্যান্য সম্মান প্রদান করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী গুরুপদানন্দ মহারাজ। ডঃ সরলা বিড়লার হাতে মানপত্র দেন সরলা মাহেশ্বরী এবং শালসহ আশীর্বাদ প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী বুদ্ধাসরনন্দ মহারাজ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বসন্ত বিড়লা বলেন, পরম্পরার থেকে শিক্ষা তথা উৎসাহ নিয়েই আধুনিক প্রজন্মকে এগোতে হবে। গুলাব কোঠারি বলেন, আধুনিক প্রজন্ম চাকচিক্যে মশগুল। এখান থেকে তাদের সঠিক দিশা দিতে হবে যা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবুও এই চ্যালেঞ্জ আমাদের গ্রহণ করে সাফল্য লাভ করতে হবে। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমিতির অধ্যক্ষ বেণুগোপাল বাঙ্গুর।

মেদিনীপুরে সরস্বতী পূজায় নজরকাড়া থিম্

ভোলানাথ নন্দী ।। গত ৩১ জানুয়ারি মেদিনীপুর কলেজ রোডে সরস্বতী পুজো প্যান্ডেলে মডেল থিমের আকর্ষণে সকালেই মানুষের ঢল নামলো। জাগরণ, ইউরেকা, অগ্নিকন্যা, প্রগতি, সংগ্রামী গোষ্ঠী, ফ্রেন্ডশিপ কর্ণার, রুদ্রবীণা গোষ্ঠী, মডেল থিমের মাধ্যমে সাম্প্রতিক জ্বলন্ত সমস্যা যথা, বাংলা থেকে ন্যানো গাড়ি বিদায়, পি টি টি আই ছাত্রদের সমস্যা, লালগড়ে জনজাতিদের উপর পুলিশী অত্যাচার, মুম্বাই সন্ত্রাসের মোকাবিলায় পুলিশ অফিসার -জওয়ানদের শহীদের মৃত্যবরণ-এর ঘটনা তুলে ধরে। ছাপিয়ে স্থান পেয়েছে সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতা।

বিভিন্ন প্যান্ডেলের কয়েকটি চিত্তাকর্ষক ছড়ার নমুনা লক্ষণীয়। যেমন—

প্রগতি প্যান্ডেলে 'পুলিশ' শিরোনামে — আমরা হলাম্‌চন্ন, / ঘুষ নেব তোদের কি?/ ম্যাও ধরেছে বুদ্ধকে। আমরা ধরবো তোদেরকে।। লাল পার্টি দিয়েছে ফরমান, বিরোধীদের জেলে চালান।।

ম্যাওবাদী
শিল্প শিল্প শিল্প
বুদ্ধদেবের বানানো গল্প
পেট কামানোর নতুন ফিকির
লাল পার্টি তাই তুলছে জিগির।
সব ব্যাটাকে করবো ফিনিশ
মাওকে জানাই লাল কুর্নিশ।

এই প্যান্ডেলে রাজেশ সিং-এর বেনামে পুলিশ সুপারকে কুকুর হিসাবে দেখানো হয়েছে। পুলিশ সুপার নিজে তাও দেখে গেছেন।

অগ্নিকন্যা প্যান্ডেলে দুটি ছড়ার নমুনা —

১) ভাগাড়েতে রাজা আমরা/নাড়ী ভুঁড়ি খাই / সর্বত্র দাদার পিন্ডি দিতে গরীব চাবকাই। শকুনরূপে সিদ্ধ পুরষ / বুদ্ধ আমার নাম / বাংলা আমার কুরুক্ষেত্র / মানুষ মারার ধাম। — বুদ্ধ

২) হাড় গিলে বিনয় আমি / বাংলা গিলে খাই ।। নোংরা বলার নেশা আমার / বিবেক হীনের ভাই / লোকের কাছে ভালো সাজি / দেখাই ভালোবাসা, বাংলা আমার সুখের ভাগাড় / গরীব খাওয়ার নেশা।। — বিনয়।

সংগ্রামী গোষ্ঠীর প্যান্ডেলে ন্যানো গাড়ির ছড়ায় :—

মোদের স্বপ্ন ছিল অনেক
তোমাকে নিয়ে ন্যানো
মোদের ছেড়ে আজকে তুমি
চলে গেলে কেন?

কয়লা মন্ত্রী সম্পর্কে —
আজকে যিনি কয়লা মন্ত্রী
কালকে দেখেন শিক্ষা
তাই কয়লা কালো শিক্ষা নিয়ে
মানুষ করে ভিক্ষা।
আসলে মন্ত্রীত্ব চাই
কয়লা বা শিক্ষার কোনও ব্যাপার নাই।
কয়লামন্ত্রী হলে কয়লা ঝাড়ব
শিক্ষা-মন্ত্রী হলে বই খাতা,
ULTIMATE হল মানুষকে SERVE করা নয়
ঝাড়াটাই বড় কথা।

"রুদ্রবীণা" প্যান্ডেলে মানচিত্রে দেখানো হয়েছে ২০০২ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদ ভারত ভূখন্ডকে ছেয়ে ফেলেছে। প্রশ্ন রাখা হয়েছে —

Terrorism Do We Tolerate ?

ফেরৎ যাচ্ছে প্রতিরক্ষার টাকা

(১ পাতার পর)

অবস্থাটা নগ্ন হয়ে গেছে। ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর লড়াই-র প্রস্তুতিই ছিল না।

বাস্তবিক চিত্র বলছে, বছরের পর বছর ধরে বরাদ্দ অর্থ ব্যয়ের অভাবটা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে পরিপূর্ণ অস্ত্রসম্ভার — বিভিন্ন দূরত্বের অটোম্যাটিক রাইফেল, স্বল্প থেকে দূর পাল্লার কামান, ট্যাঙ্ক, আধুনিক যুদ্ধবিমান, যুদ্ধ জাহাজ, ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যম ও র‍্যাডার এর মতো অতি আবশ্যক উপকরণের অভাব প্রকট। এই অভাব পূরণ কিন্তু এখনও হয়নি। নতুন ১৫৫ মিলিমিটার কামান কেনা এখনও বাকী।

১৯৮৭-র বফর্স কামান-কেলেঙ্কারির রহস্য এখনও থেকে গেছে। প্রতিবছরই দেখা যাচ্ছে সেনাবাহিনীর চাহিদা থেকেই যাচ্ছে, অথচ বরাদ্দ অর্থ খরচ না হয়ে ফেরৎ চলে যাচ্ছে। একথা সেনাবাহিনী সূত্রেই জানা গেছে।

সেনাবাহিনীর যে জওয়ানরা জম্মু-কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ করছে তারা এ নিয়ে বেশ ক্ষুব্ধ। তাদের হাতে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম- যেমন, হাল্কা বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, নাইট-ভিশন ক্যামেরা এবং উচ্চশ্রেণীর রাইফেল, যোগাযোগের আধুনিকতম ইলেকট্রনিক সিস্টেম প্রভৃতি এখনও খুবই দরকার। যে কোনও ধরনের সন্ত্রাসী আক্রমণ মোকাবিলার জন্য অভিযানমূলক পূর্ব-প্রস্তুতি একান্ত প্রয়োজন। এখনও সাত হাজার কিলোমিটার উপকূল এলাকা নজরদারি করার জন্য উন্নত র‍্যাডার সিস্টেম চালু করা যায়নি। গত দু'বছরে রিকুইজিশনও করা হয়নি। উল্লেখ্য, সমুদ্র উপকূল রক্ষার ক্ষেত্রেও এই উদাসীনতার কথা স্বস্তিকা-তে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

কিছু নিয়মতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা, পরপর দুটো অর্থ বৎসরের চাপাচাপি, ডিফেন্স ডীল সম্পর্কে কিছু খুঁটিনাটি বাঁধা -ধরা নিয়ম, কঠোর পরীক্ষামূলক পদ্ধতি, দরপত্র আহ্বানে দেরি — সব মিলিয়ে টাকা উদ্বৃত্ত এবং ফেরৎ যাচ্ছে।

সেনাবাহিনী এবং সাধারণ আমলাতন্ত্র ডিফেন্স ডীল-এ বিভিন্ন ধরনের তদন্তকে ভয় পায়। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ার আশংকাই এই ভয়ের কারণ। সেজন্য সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণে অযথা কালক্ষেপ হচ্ছে বলেও অনেকের অভিমত। আবার এসময়ে আগামী ১০০ দিনের মধ্যেই কেন্দ্র সরকারকে নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হবে। এজন্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব সত্বর কোনও সামরিক -শস্ত্রাস্ত্র ক্রয় চুক্তি করতে পিছিয়ে যাচ্ছে।

সব মিলিয়ে বর্তমান প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনি বলেছেন, অহেতুক জটিল পদ্ধতি, লাল ফিতের ফাঁস দূরে সরিয়ে সামরিক প্রস্তুতিতে দ্রুত কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। সরকার যদিও বড় বরাদ্দ মঞ্জুর করছে তা সত্বেও আধুনিকীকরণের প্রয়াসে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

জঙ্গিদের ব্যবহার করছে পাকিস্তান

(৩ পাতার পর)

এক লহমায় গুঁড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে ভারতবর্ষ। অনাকাঙ্ক্ষিত দু-একটি বিক্ষিপ্ত যুদ্ধ ছাড়া ভারতবর্ষ আজ পর্যন্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে কড়াভাবে রুখে দাঁড়াতে চায়নি। কারণ যুদ্ধবিগ্রহ এবং অহেতুক রক্তক্ষয়ে সর্বাবস্থায় অনিচ্ছুক সভ্যতার উন্মেষভূমি ভারতবর্ষ। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ভারতের সনাতন আদর্শ। যদিও পাকিস্তান বিশ্বাসঘাতকের মতো বার বার এ দেশের শান্তি বিনষ্টের প্রয়াসকে সমানতালে চালিয়ে যাচ্ছে।

মুম্বাই মহানগরের রক্তক্ষয়ী জঙ্গি হানার পর গোটা ভারতবর্ষের মানুষকে একটা অজানা আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ভারতের প্রতিটি মানুষ সন্ত্রস্ত মনে প্রশ্ন তুলছেন, ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ইসলামি সন্ত্রাসীদের এত চরম শত্রুতা কেন? নাকি গভীর ষড়যন্ত্রের বলি হতে গিয়ে বার বার জঙ্গি হানার মুখ পড়তে হচ্ছে এ দেশকে। এহেন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের কাছে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে পাক ইসলামি জঙ্গিরা ভারতবর্ষে ইসলামি শাসন কায়েম করার উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মীয় জেহাদ চালিয়ে গেছে। তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম, জঙ্গিরা ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে এ দেশের বুকে নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই জানতে ইচ্ছে করে যে, এ দেশে বংশানুক্রমিকভাবে যেসব মুসলমান বসবাস করছেন তারা কি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী নন। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাধিক্য রাষ্ট্র এই ভারতবর্ষের কয়েক কোটি মুসলমানরা কি অমুসলিম হয়ে পড়েছেন যে তাদের পরিত্রাণের জন্য ভারতে ইসলামি শাসন জরুরি। কট্টর ইসলামি জঙ্গি বা ধর্মীয় মৌলবাদীরা যদি এমনটা মনে করে থাকেন, তা হলে কেন তাদের নাশকতা থেকে মুসলমানরা রেহাই পাচ্ছেন না। নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে ইসলামি জঙ্গিরা যে বর্বরতা চালাচ্ছে তা কোনও অবস্থায় জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ নয়। গণতান্ত্রিক ভারতের মুসলমানরা যে সুখে রয়েছেন, বিশ্বের তাবড় ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক জীবনে ততটা সুখে নেই মুসলমানরা। যে পাকিস্তান ধর্ম ধর্ম বলে চেঁচায় সেই পাকিস্তানেই ইসলাম সবচেয়ে বেশি পদদলিত। হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, রক্তক্ষয় পাকিস্তানীদের মজ্জাগত। নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করে কাতারে কাতারে মানুষ মরছে তথাকথিত ইসলামি রাষ্ট্রগুলিতে কারণ, ইসলাম প্রকৃতার্থে হত্যায় বিশ্বাসী নয়।

পাকিস্তান কায়েমি স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করতে গিয়ে জেহাদি তৈরি করছে, প্রশ্রয় দিচ্ছে মৌলবাদী জঙ্গিগোষ্ঠীকে। পাকিস্তানের কট্টর ইসলামপন্থী ভারত-বিদ্বেষীদের সন্তুষ্ট রাখতে সময়ে সময়ে এসব জঙ্গিদের ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য পাকিস্তানী শাসকদের কাছে এটা অপরিহার্য। কারণ গোঁড়া ইসলামপন্থী পাকিস্তানে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র হচ্ছে ধর্ম। পাকিস্তানে যারাই ক্ষমতায় আসেন তারাই জানেন সরাসরি ভারতের সামনে দাঁড়ানোর মুরোদ নেই পাকিস্তানের।

তাই জঙ্গি হানায় প্রচ্ছন্ন মদত জুগিয়ে ভারতের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে অগ্নিগর্ভ করে তুলতে পাকিস্তানের নিরন্তর প্রয়াস চলছে।

(দৈনিক যুগশঙ্খ-এর সৌজন্যে)

জেলেই থাকতে হবে

(১ পাতার পর)

বাংলাদেশী নাগরিকদের সহজে ঢুকে পড়ার ও অবাধে বসবাস করার পক্ষে কোনও অসুবিধাই নেই। একটি ক্ষেত্রে আবার একজন পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট তার রিপোর্টে লিখিতভাবে জানিয়েছেন, আবেদন -কারীকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ ওই ব্যক্তি নিজেই ট্রাইব্যুনালে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছিলেন।

হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে আরও যা বের হয়েছে — কর্তৃপক্ষ এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গা-ছাড়া, নরম, ঢিলেঢালা ও অবহেলাকর মনোভাব নিয়ে চলেছেন। অথচ রাজ্যের জনসংখ্যা ও জনবসতিগত চরিত্রটাই বদলে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে, রাজ্যের প্রকৃত মূল অধিবাসী অসমীয়ারাই রাজ্যের অনেক এলাকার সংখ্যালঘু হয়েছেন বা হতে চলেছেন। এটাই বাস্তব অবস্থা। এক্ষেত্রে রাজ্যের উচ্চ-আদালত সর্বানন্দ সোনোয়াল-এর মামলায় সুপ্রীম কোর্টের প্রদত্ত রায়কে উল্লেখ করেছে। এই প্রসঙ্গে হাইকোর্ট করিমগঞ্জ সেক্টর পরিদর্শনকারী কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলের বক্তব্যকেও উদ্ধৃত করেছে। ওই কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা বলেছিলেন, অসমে বৈধ ভাবে ঢুকেও বেশির ভাগ বাংলাদেশী আর ফিরে যায় না। এছাড়া সীমান্তে ভিসা-পাসপোর্ট পরীক্ষার বিষয়ে অনেক ঢিলেঢালা ও অব্যবস্থা রয়েছে।

হাইকোর্টের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হল — কেন্দ্র ও রাজ্য মিলে যথাশীঘ্র আরও বেশি করে বিদেশীদের (বাংলাদেশী) আটক রাখার ব্যবস্থা করুক, এবং যতদিন না বিচার শেষ হবে ততদিন আটক রাখুক।

রাজ্য রাজনীতি

সি পি এমের বিরুদ্ধে সব দলের নীচের তলার কর্মীরা একত্রিত হচ্ছে

নিশাকর সোম

নিশাকর সোম ।। রাজ্য-রাজনীতির আবর্তেএখন সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের চারটি দল যথা — সিপিএম, সিপিআই, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গেছে। সিপিএম-এর সামনে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে মূলত ইউপিএ সরকারের উপর থেকে সমর্থন তোলার বিষয় নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ নেতা মনে করেন যে ইউ পি এ সরকারের উপর থেকে সমর্থন তোলার ফলে কংগ্রেসকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করা হল। ফলে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব আর সিপিএম-এর সমর্থনের জন্য পরোয়া করে না। নেতৃত্বের এই অংশ মনে করেন — যদি সমর্থন তোলা না হতো তা'হলে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস-এর সঙ্গে ঐক্য করার কথা উঠতো না। এতো গেল সিপিএম-এর রাজনৈতিক সমস্যা। সিপিএম-এর সাংগঠনিক সমস্যা খুব সঙ্কটজনক। প্রতিটি জেলার সাংগঠনিক কনভেনশনে রাজ্য নেতৃত্ব এবং স্ব স্ব জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নাম করে সমালোচনা উঠেছে।

এমন সমালোচনাও হয়েছে — বুদ্ধ বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী রেখে নির্বাচনী প্রচার করা হলে ভোট কমে যাবে? বিমানবাবু সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি এন জি ও চালাবার যোগ্যতা রাখেন। আরও বলা হয়েছে বুদ্ধ, বিনয় কোঙার, শ্যামল চক্রবর্তী এবং বিশেষ করে সুভাষ চক্রবর্তীর প্রকাশ্য বক্তব্য পার্টিকে কঠিন প্রশ্নের মুখে ফেলে দিচ্ছে।

বলা হয়েছে, বুদ্ধ বাবুর মুখ্যমন্ত্রিত্ব কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। সমস্যাকে জটিল করে দিচ্ছে।

উল্লেখ করা হয়েছে যে, লালগড় সমস্যা, গোর্খাল্যান্ড সমস্যা কোনওটাই মেটাতে পারেনি বুদ্ধ বাবু। এছাড়া তিনি নন্দীগ্রাম সিঙ্গুর কান্ড-এর সময়ে রাজনৈতিক বাচালতা করে, তৃণমূলনেত্রীকে জনগণের সামনে দেদীপ্যমান করে দিয়েছেন। এই সমালোচনা কেন্দ্রীয় কমিটির নতুন সদস্যগণও করেছেন। আজকে পার্টির মধ্যে একাংশ মনে করেন যে — সর্বস্তরে নেতৃত্বের বদল দরকার। তাঁরা আরও মনে করেন যে নেতৃত্ব নিজেদের দোষ-ত্রুটি-অহমিকা সম্পর্কে আত্মসমালোচনা বিমুখ। তাই নেতৃত্ব শুধু নীচের তলার কর্মীদের দোষ দিচ্ছেন। বিমানবাবু ফরমান জারি করেছেন নিষ্ক্রিয় সদস্যদের পার্টির সদস্যপদ খারিজ করা হোক। কিন্তু নিষ্ক্রিয় নেতাদের কিছু করা হবে না। কারণ নেতৃত্বের স্তরে "পরস্পর পিঠ চুলকানি সঙ্গত"। তা না হলে সুভাষ চক্রবর্তী এখনও পার্টিতে থাকার সুযোগ এবং প্রোমোশন পান কী করে। এতো শিশুপাল থেকেও শক্তিশালী।

কলকাতা কনভেনশনে কলকাতা

মমতা ব্যানার্জী

জেলার সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতিটি সদস্য সম্পর্কেও চাঁচাছোলা বক্তব্য উপস্থিত হয়েছে। একাধিক জেলা কমিটি সদস্য/সদস্যা সম্পর্কে গোষ্ঠীবাজির অভিযোগ উঠেছে। কনভেনশনে দাবি উঠেছে অলোক মজুমদারকে ফিরিয়ে এনে পূর্বপদে বহাল করা হোক। এ-দাবি মলয় চ্যাটার্জি, অসিত নন্দীসহ উত্তর কলকাতার সব সদস্যের মত।

দার্জিলিং তথা গোর্খা-মোর্চার আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে দার্জিলিং, ভুটান এবং সিকিম নিয়ে ফেডারেশন গড়ার পুরানো কথা আবার আসবে। গ্রেটার নেপালের কথা তো এই পত্রিকায় পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

লালগড়-সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-এ নকশাল-পন্থীরা যথেষ্ট আসর জমিয়েছে। ফলে মাও জে দুং-এর তত্ত্ব-গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার রণনীতি-রণকৌশল নকশালপন্থী সকল গোষ্ঠী প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে। তিন দশক ধরে গ্রামে আদিবাসি-বনবাসিদের বঞ্চনার ফলে তারা আজ নকশালপন্থীদের উপর নির্ভর

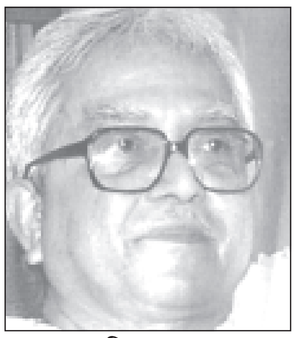

বিমান বসু

করতে শুরু করেছেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণ নকশাল গোষ্ঠীদের একটি কৌশলমাত্র। তারা নির্বাচনী প্রচারের মাধ্যমে তাদের রাজনীতি প্রচার ও নীচের স্তরের দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে গোপন সংগঠন গড়ে তুলবে। তাই বলি, পশ্চিমবঙ্গের অপদার্থ আত্মম্ভরী মন্ত্রিত্বের বিদায় দিয়েই পশ্চিমবঙ্গকে বিপদমুক্ত করা যেতে পারে।

কিন্তু এতে বাদ সেধেছে — এস ইউ সি, তৃণমূল এবং কংগ্রেস। এস ইউ সি নেতা প্রভাস ঘোষ বলেছেন — ঐক্যকামী কংগ্রেসিরা তৃণমূলে যাক। কংগ্রেস ভাঙার আহ্বান। আর প্রদেশ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য এবং এস ইউ সি নেতা একই মঞ্চে বক্তৃতা করে যাচ্ছেন!

এবার দেখা যাক — ফরওয়ার্ড ব্লকের অবস্থা, সম্প্রতি ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক বলেছেন, 'বামফ্রন্ট কেউ ভাঙতে পারবে না, একথা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বামফ্রন্ট ভাঙার সম্ভাবনা আছে। বামফ্রন্ট তো ভাঙা ফ্রন্ট। অশোকবাবু, আপনি তো মমতাদেবীকে নেত্রী বলেছিলেন। ঘন ঘন সভা করে মমতাকে বলেছিলেন-সিপিএম-এর বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক সমর্থন জানাবে। এখন অবশ্য নির্বাচনের বৈতরণী পার হওয়ার জন্য সিপিএম-নেতাদের পিঠ চাপড়াচ্ছেন! ফরওয়ার্ড ব্লকের অভ্যন্তরীণ লাঠালাঠি চলছে। প্রাক্তন মন্ত্রী সরল দেব বস্তুত লোকসভার নির্বাচনে প্রার্থী হবার জন্য অশোকবাবুর সামনে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে সরল দেব, শান্তি গাঙ্গুলী, শৈলেন দে — এই ত্রয়ী ১৯৬২ সালে জেলে (আটক) বন্দী থাকাকালীন সিপিএম নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং এই 'থ্রি এস' বলতেন তাঁদের ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আর এস পি-এর মন্ত্রী "বিপ্লবী" নেতা ক্ষিতি গোস্বামী পূর্ব মেদিনীপুরে বিমান বসুর

দীপা দাসমুন্সী

বক্তব্য সমর্থন করে সংবাদপত্রে জানিয়েছেন। আর এস পি-এর মধ্যেও লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হবার লড়াই চলছে। কে বা হবেন প্রার্থী তারই লাগি কাড়াকাড়ি।

কথায় আছে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। এক দৈনিকের এক জেলার সংবাদদাতার প্রকাশিত এক সংবাদ প্রকাশের পর সিপিএম-এর দৈনিকে এক উস্কানিমূলক লেখা প্রকাশিতহয়। তার উত্তর সেই দৈনিক দেয়। এই সংবাদ প্রকাশের পর একজন মহিলা আত্মহত্যা করেন। থানায় মৃতার পরিবার এফ আই আর করে। সেই সাংবাদদাতা গ্রেপ্তার হন।

তাঁর মুক্তির দাবিতে ওই দৈনিকের মিছিল এবং সভা হয়। সেই সভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকাকতি সেই সভায় — বক্তৃতায় ধর্মের নাম করে বলেন "নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী হবেনই"। বন্দী মুক্তির সভা নির্বাচনী সভায় পর্যবসিত হল! সিপিএম-এর অন্যায় নীতির জন্য এক অলীক কু-নাট্য অভিনীত হল।

আগামী লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কলকাতায় এবং শহরতলিতে অবরোধ, ধর্না এবং সত্যাগ্রহ চলছেই। এ-সব বুদ্ধদেববাবুর সরকারের ব্যর্থতা। এই ব্যর্থ সরকারের বিদায়ের জন্য সমবেত প্রচেষ্টা দরকার।

কিন্তু সে প্রচেষ্টায় বাধা নেত্রী এবং কিছু নেতা-নেত্রী চান তাঁর শর্তে নেতারা আসুন (বিজেপি বাদে)। নেত্রী ঘোষণা করেছেন যে, বিজেপি সাম্প্রদায়িক এবং দাঙ্গাবাজ! নেতাদের একাংশ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর জায়া বললেন — মর্যাদা হারিয়ে ঐক্য নয়।

রাজ্যের এই অস্থির এবং নীতিহীন আবর্ত সৃষ্টিকারী দলগুলির বিরুদ্ধে স্থিতিশীল এবং নীতিসমৃদ্ধ প্রচারে নামার সংগঠন দরকার। সেই সংগঠন যদি আজ না সফল হয় তবে আগামীদিনে বিকল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবেই।

সিপিএম নেতৃত্ব ভীত-সন্ত্রস্ত। তাই বামফ্রন্টের উপর তলার ঐক্যের আস্তরণের তলায় বামদলগুলির নীচের তলার কর্মী নেতা-সদস্যগণ সিপিএম-কে পরাজিত করার জন্য যে কোনও কৌশল নেবে — সেটা স্পষ্ট দেখা যাবে আগামী লোকসভা নির্বাচনে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে জনগণের রোষের আগুন স্পর্শ করবে দাম্ভিক সিপিএম-কে। কালের যাত্রার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

অ ঢ রকম

লাল সেলামে অরুচি

নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতা দেখে গড়চিরোলি (মহারাষ্ট্র) জেলার নকশাল আন্দোলনকারী কৃষকরা আত্মসমর্পণ করে নতুন জীবন শুরু করার প্রচেষ্টা করেছেন। তাদের জীবনে এই পরিবর্তন আসায় তাদের মুখে এখন "লাল সেলাম"— নয় "জয় গুরুদেব" ধ্বনি। এই আধ্যাত্মিক মন্ত্রের ফলে তাদের জীবনে গঠনমূলক কাজের ভাব এসেছে।

নক্শাল আন্দোলনের নেতারা গরীব এবং অত্যাচারিত যুবক-যুবতীদের হাত ধরে তাদের মনে সরকার বিরোধী চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তাদের অশান্ত মনের আগুনকে প্রখর করার জন্য তাদের হাতে অস্ত্র দিয়েছিল। এর ফলে অনেক নিরপরাধ মানুষ অকারণে মারা পড়েছেন। বিপ্লবের মশাল জ্বালাবার জন্য "গদর" কবির গীতগুলোর ফলে অনেক যুবক নকশাল আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। "লাল সেলাম" ধ্বনি দিতে দিতে হাতে শস্ত্র নিয়ে শত শত নিরপরাধ লোককে হত্যা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেরা 'বিপথে যাচ্ছি' — এই অনুভূতির ফলে তারা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

আত্মসমর্পিত নকশালদের মানসিক শান্তি প্রদানের জন্য "আর্ট অফ লিভিং"-এর শিবিরে ভর্তি করা হয়। আধ্যাত্মিক

লক্ষ্মীদিদির ক্লাস চলছে।

আন্দোলনের পরিচালক শ্রীশ্রী রবিশঙ্করজীর সাথে সাক্ষাৎ করানো হয়। ফলে যারা আজ পর্যন্ত "লাল সেলাম" ধ্বনি দিত, তারাই এখন "জয় গুরুদেব" ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করছেন।

অনেক নকশালরা ভুল পথে যাওয়ার দুঃখে — পশ্চাত্তাপ করেছেন। তাদের চোখ থেকে অশ্রু বেরুচ্ছে।

যারা আত্মসমর্পণ করেছে তারা যাতে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেন, তার জন্য সরকারের তরফে কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। তবুও জীবনের অনেক বছর এই আন্দোলনে নষ্ট হওয়ার ফলে, মানসিক শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। এই সব নকশালদের জীবনের অশান্তি দূর করার জন্য গড়চিরোলি পুলিশও আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা হাতে নিচ্ছে। তারা সুফলও পাচ্ছে।

"আর্ট অফ লিভিং" আন্দোলনের মাধ্যমে যুবা নেতৃত্ব শিবির পুলিশই আয়োজন করেছে, যেসব নকশালরা আত্মসমর্পণ করেছেন, তাদের ওখানে পাঠাবারও ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। এই শিবিরে মার্গদর্শন করতে মুম্বাই থেকে শ্রীমতী লক্ষ্মী দিদি এসেছিলেন। শিবিরে আত্মসমর্পণকারী নকশালরা নিজ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তারা যাতে স্বনির্ভর হতে পারেন, তার জন্য নানা প্রকল্প শুরু করা হয়েছে।

এর ফলে শান্তিময় জীবনের আস্বাদ তারা নিশ্চয়ই পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রশ্নবিদ্ধ বাংলাদেশের উপজেলা ভোট

সোহরাব হাসান।। নাগরিক সমাজের যেসব পণ্ডিত স্থানীয় সরকারকেগণতন্ত্রের সর্বরোগহারী প্রতিষেধক জ্ঞান করেছিলেন সদ্য অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচনে তারা হতাশ হবেন। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল কোথায় কতটা প্রভাব সৃষ্টি করেছে, কতটি কেন্দ্রে হাঙ্গামা হয়েছে, তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বল্পসংখ্যক ভোটারের উপস্থিতি।

মাত্র ক'দিন আগে, ২৯ ডিসেম্বর সারাদেশে যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল তাতে ছিল উৎসবের আমেজ। ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। বিশেষ করে নারী ও নতুন প্রজন্মের ভোটারদের উপস্থিতি ছিল রেকর্ড সংখ্যক। গড়ে শতকরা ৮৭ জন ভোট দিয়েছেন। প্রায় সব কেন্দ্রে ভোট হয়েছে শান্তিপূর্ণ। কোনও উত্তেজনা, হাঙ্গামা ছিল না। কালো টাকা ও পেশীশক্তির দৌরাত্ম্য ছিল না। স্বল্প আয়ের মানুষ, গরীব মানুষ গাঁটের পয়সা খরচ করে গ্রামে গিয়েছেন ভোট দিতে। এমনটি অতীতে কখনও দেখা যায়নি। সে বিচারে এবারে আওয়ামী লীগ তথা মহাজোট সরকারটি হল পরিবারের ভোটে নির্বাচিত সরকার। এখন দেখার বিষয় তারা গরীবের আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটা পূরণ করতে পারে?

তবে শুরুটা যে ভালো তাতে সন্দেহ নেই। গত কয়েক দিনে সরকার বেশ কিছু সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশেষ করে সারের দাম অর্ধেকে নামিয়ে আনায় কৃষকরা উপকৃত হচ্ছেন। ডিজেলের দামও কমানো হয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, আরও কমানো প্রয়োজন। তাতে কৃষক অধিক ফসল ফলাতে উৎসাহিত হবেন। পাচার হওয়ার ভয়ে সারের দাম না কমানোর যুক্তি নেই। পাচার রোধ করার দায়িত্ব সরকারের।

সাহসী তত্ত্বাবধায়ক সরকারও যেসব সিদ্ধান্ত নিতে দোনোমনো করত, হাসিনা সরকার এখন ঝটপট সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এটি ভালো লক্ষণ। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেয়ে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা বেশি কঠিন।

সরকার সারের দাম কমিয়েছে, ভোজ্য তেলের দামও কমিয়েছে। চাল ও আটার দামও কমতির দিকে। সেক্ষেত্রে সরকারের এক নম্বর এজেণ্ডা — অনেকাংশে সফল। কিন্তু এ মুহূর্তে সরকারের সামনে বড় সমস্যা বি এন পি নয়, তার ঘরের ছেলে ছাত্রলীগ। আমরা মনে করি ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের বে-আইনি তৎপরতা বন্ধ করতে না পারলে, তাঁর অনেক সাফল্যই ম্লান হয়ে যাবে। অতএব সাধু সাবধান!

২৯ ডিসেম্বরের জাতীয় সংসদ ও ২২ জানুয়ারি উপজেলা নির্বাচনকে পাশাপাশি রাখলে আমরা কী দেখতে পাই। প্রথম নির্বাচনটি ছিল ব্যতিক্রমী, হাঙ্গামাহীন। জনমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে তৃতীয় বিশ্বের একটি আদর্শ নির্বাচন, কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার পেতে পারে। বি এন পি নেতারা নির্বাচনে তাদের হারিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে যতই চিৎকার করুন না কেন, দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষকেরা দেখেছেন বাংলাদেশেও পারে — যেদেশে নির্বাচন নিয়ে এত ক্যাচাল, এত আন্দোলন, সংগ্রাম ও লাগাতার জরুরি অবস্থান, সেদেশে এ ধরনের নির্বাচন সম্ভব হয়েছে। কারণ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির অদম্য ইচ্ছা, আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীল আচরণ।

খালেদা

হাসিনা

সে তুলনায় উপজেলা নির্বাচনটি ছিল সাদামাটা, ঢিলেঢালা। বিক্ষিপ্ত সংঘাত-সংঘর্ষে উত্তপ্ত। ভোটারের স্বল্প উপস্থিতি। প্রথম নির্বাচনটি হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। দ্বিতীয় নির্বাচনটি হয়েছে দলীয় সরকারের অধীনে। তাহলে কী আমরা ধরে নেব দলীয় সরকারের অধীনে কোনও সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হতে পারে না?

এই প্রশ্নের সহজ উত্তর নেই। নোয়াখালি -১ নং আসনের উপনির্বাচনটি হয়েছিল দলীয় সরকারের অধীনে। বাংলাদেশে নির্বাচনী বিরোধ আন্দোলনের সূচনাও উপ-নির্বাচন নিয়ে। খালেদা জিয়ার প্রথম সরকারের আমলে মাগুরা উপ-নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঘটেছিল তা আমরা জানি। সে উপ-নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে। নোয়াখালি উপ-নির্বাচনে সে রকম কিছু ঘটেনি। বরং সবাইকে অবাক করে দিয়ে বিরাট ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে হারিয়ে জয়ী হন বি এন পি প্রার্থী। যেকোনও নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠ ও স্বতঃস্ফূর্ত হওয়ার জন্য কিছু পূর্বশর্তপূরণ করা প্রয়োজন। নির্বাচন পরিচালনা করে নির্বাচন কমিশন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকে সরকার। কিন্তু নির্বাচনের মূল দুই পক্ষ হল ভোটার ও প্রার্থী। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেষোক্ত দুই পক্ষের যে আগ্রহ উদ্দীপনা ছিল উপজেলা নির্বাচনে তা ছিল না।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি হয়েছিল দীর্ঘ দুই বছরের জরুরি অবস্থা অবসানের পর এবং গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠায় — গণমানুষের তীব্র আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে।

আর উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় নির্বাচনের এক মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে। নির্বাচিত সরকার সবেমাত্র দায়িত্ব নিয়েছে। এখনও জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসেনি। স্বভাবতই জনগণের চোখ নতুন সরকারের প্রতি। দ্বিতীয়ত উপজেলা নিয়ে বিস্তর তাত্ত্বিক আলোচনা হলেও, এ পর্যন্ত সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিবেশে একটি নির্বাচনও হয়নি। ১৯৮৫ সালে সামরিক শাসক এরশাদ প্রথমবার উপজেলা নির্বাচন করেন — সব বিরোধী দলের আন্দোলনও বয়কটের মুখে। বিরোধী দলগুলো তখন এরশাদকে হটাতে জোটগত আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। দ্বিতীয়বার উপজেলা নির্বাচন হয় ১৯৯০-র গণ আন্দোলনের আগে। সেবারও কোনও বিরোধী দল নির্বাচনে অংশ নেয়নি। তবে উপজেলা নির্বাচনটি যেহেতু দলীয় ভিত্তিতে হয় না, সেহেতু বিভিন্ন দলের স্থানীয় নেতারা অংশ নিয়েছেন। উপজেলা নির্বাচনের প্রধান উদ্দেশ্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলা। যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই সেখানে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠবে কীভাবে? এবারের উপজেলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও পরিবেশ অনুকূল ছিল না। জাতীয় সংসদ নির্বাচন যেকোনও মূল্যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে হবে বলে নির্বাচন কমিশন যে সর্বাত্মক প্রয়াস নিয়েছিল, উপজেলার ক্ষেত্রে তা লক্ষ্য করা যায়নি। অন্যদিকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলও উপজেলা নির্বাচনে পরোক্ষভাবে প্রভাব রেখেছে। জনগণ ধরেই নিয়েছিল, উপজেলা নির্বাচনের ফলাফলও ব্যতিক্রমী কিছু হবে না। অর্থাৎ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী দলের প্রার্থীরা এই নির্বাচনেও জয়ী হবে। ঘোষিত ফলাফলে দেখা যায়, ৪৭৪টি উপজেলা চেয়ারম্যান পদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ পেয়েছে আওয়ামী লীগ সমর্থক প্রার্থীরা। বিরোধী দল বি এন পি এবং জামায়াত শতাধিক উপজেলায় জয়ী হয়েছে। অর্থাৎ জাতীয় নির্বাচনের চেয়ে এ দুটি দল উপজেলা নির্বাচনে ভালো ফল করেছে। সংঘাত-সংঘর্ষের কারণে ৬টি উপজেলায় নির্বাচন স্থগিত রয়েছে।

উপজেলা নির্বাচন নিয়ে ঢাকার নাগরিক সমাজ যতটা ভাবিত ও আলোড়িত সাধারণ ভোটাররা ততটা নন। তারা স্থানীয় যোগ্য প্রতিনিধি বলতে জাতীয় সংসদ সদস্যকেই বোঝেন। নাগরিক সমাজ এতদিন বলে আসছিল, জাতীয় সংসদ সদস্যদের কাজ শুধু আইন প্রণয়ন করা, আর স্থানীয় উন্নয়ণ করবে উপজেলা পরিষদ তথা উপজেলা চেয়ারম্যান। এ ধরনের প্রতারণা

নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় সাংসদরা স্থানীয় সমস্যা ও উন্নয়ন নিয়ে নির্লিপ্ত থাকতে পারেন না। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশেও সাংসদদের নিজ নিজ এলাকার ভোটারদের সমস্যা ও অসুবিধাগুলো দেখতে হয়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সেগুলি প্রতিকার করতে হয়। আমাদের এখানেই সেই উন্নয়ণ ও সমস্যার বিষয়টি এককভাবে উপজেলা পরিষদের হাতে ছেড়ে দিলে দুর্নীতি, দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতি আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। ইউনিয়ন পরিষদ, চেয়ারম্যান, মেম্বারদের ক্ষমতা সীমিত। অর্থ বরাদ্দ নগণ্য। তা সত্ত্বেও রিলিফের গম ও টিন আত্মসাতের ঘটনা কম ঘটছে না। এক্ষেত্রে ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন এবং একজন অপরের কাজ হস্তক্ষেপ করবেন না। তবে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকলে এবং নিয়মিত তদারকি করলে কিছুটা সুফল পাওয়া যেতে পারে।

এবারের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলো শিক্ষা নিতে পারে। শিক্ষা নিতে পারে সরকারও। দলীয় সরকারের অধীনেও যে ভালো নির্বাচন হতে পারে মুখে বলে নয়, কাজেই তা দেখাতে হবে। *(সৌজন্যে ঃ দৈনিক সংবাদ)*

আশ্বাস দেওয়া হয়, তদন্ত শেষ হয় না

উত্তর দিনাজপুরে বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

মহাবীর প্রসাদ টৌডী ।। উত্তর দিনাজপুর জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার গাফিলতির অভিযোগের তদন্তে গঠিত বিভিন্ন কমিটির রিপোর্ট আজও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে জমা পড়েনি। জেলা পরিষদের তরফেও এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। দপ্তর সূত্রেই জানা গিয়েছে যে, অধিকাংশ তদন্ত কমিটির কাজ মাঝপথেই অজানা কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

সম্প্রতি ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে এক রোগিণীর রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ে ভুল হয়। অভিযোগ যে, হাসপাতালের ভুল রিপোর্টের জন্য ওই রোগিণীকে অন্য গ্রুপের রক্ত দেওয়া হয়। ফলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রোগিণীকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়েও বিস্তর প্রশ্ন রয়েছে। গত এক বছরে রায়গঞ্জ জেলা ও ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের কাজকর্ম ও পরিষেবা নিয়ে প্রচুর অভিযোগ ওঠে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্যদপ্তর অভিযোগের তদন্তের আশ্বাস দিলেও, বাস্তবে কিছুই হয়নি বলে রোগীর আত্মীয়-অভিভাবকরা বারবার ক্ষোভ জানিয়েছেন।

গত বছরে করণদিঘী ব্লকে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত দুই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গড়া হয়। ওই ঘটনায় মোট ১৭টি শিশুর মৃত্যু হয়েছিল বলে অভিযোগ আছে। আরও অভিযোগ যে, শিশু মৃত্যুর শুরুতেই অভিযুক্ত চিকিৎসকদের গাফিলতি ছিল। জেলার বাসিন্দারা বলেছেন, রোগীর মৃত্যু হলে ঘেরাও ও ভাঙচুরের সময় উত্তেজিত জনতাকে সামাল দিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তদন্ত কমিটি গঠনের আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোনও তদন্তই

হয় না। অথবা তদন্ত শুরু হলেও তা শেষ হয় না। বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের চাপে তদন্তের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে দোষীদের কোনও সাজাও হয় না। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরও এই পরিস্থিতির কথা স্বীকার করেছে।

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুধাংশু শেখর সাহু বলেন, বিভিন্ন কারণে তদন্ত বন্ধ হয়ে যায়। কিছু নাকি করার নেই।

এব্যাপারে তথ্যাভিজ্ঞ মহল অভিমত প্রকাশ করেছে যে, উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ব্লকে স্বাস্থ্য পরিষেবা বেহাল হয়ে পড়েছে। অনেক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বেডের ব্যবস্থা নেই। আবার ওইসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আশেপাশের এলাকায় রাতে কেউ অসুস্থ হলে, বাসিন্দাদের ওঝা বা হাতুড়ে ডাক্তারের উপরই ভরসা করতে হয়। এছাড়া অনেক গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র মাঝেমাঝেই বন্ধ থাকে। আর খোলা থাকলেও, সেখান থেকে নিয়মিত ওষুধ পাওয়া যায় না। প্রায়ই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার অনুপস্থিত থাকে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি একমাত্র স্বাস্থ্যকর্মীর ভরসাতেই চলে। প্রশ্ন উঠেছে যে, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে মানুষ যখন বীতশ্রদ্ধ, তখন সম্প্রতি একটি বেসরকারি হাসপাতালের উদ্বোধন করতে গিয়ে বিদেশ মন্ত্রী ও রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখার্জী এরাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন কী করে? প্রণববাবুর এ প্রশংসায় একদিকে রাজ্যের রাজনৈতিকমহল যেমন হতবাক, অন্যদিকে তেমনি রাজ্যের মানুষও স্তম্ভিত।

মহারাষ্ট্রে বিল পাস

শুরু হচ্ছে পরিচারিকাদের প্রফিডেন্ট ফাণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দু'দশক ধরে চলা সংগ্রামের শেষ পর্যন্ত অবসান হল। সারাদিন বাসন মেজে হাতে হাজা ধরলেও ওষুধ কেনার যে পয়সাটুকু জুটতো না, এখন তা পাওয়া যাবে। কাজের বিনিময়ে উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার 'বিল' এবার হাতের মুঠোতে। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মহারাষ্ট্র সরকার পাকাপাকিভাবে পাস করল 'গৃহস্থালী পরিচারক কল্যাণ সভা বিল'। এই নতুন আইনে সরকারের মাইনে দেওয়া চাকুরেদের মতো পরিচারক-পরিচারিকারাও নির্দিষ্ট বেতন পাবে। এই বিলে বলা হয়েছে, মাস-মাইনের সঙ্গে ছুটি ও বোনাস দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। এই সকল সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কম সুদে ঋণ, হেলথ্ ইনসিওরেন্স এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডও তারা পাবে।

পনেরো বছর আগে দক্ষিণ মুম্বাই-এর 'কাফে প্যারেডে' বর্ণময় জমায়েত-এর জল শেষমেশ গড়ালো মহারাষ্ট্র বিধানসভায় গৃহস্থালী পরিচারকদের কল্যাণ বিল পর্যন্ত। পরিচারক-পরিচারিকারা এখন মনে করলেই রাজ্যের শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। আরও কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে সে বিষয়ে জেলাভিত্তিক কল্যাণ দপ্তরগুলিতে তা নির্ধারিত করা হয়েছে। বিলের জন্য দীর্ঘ দু'দশক ধরে কাজ করে চলা বিদর্ভ মোল কারিন সংগঠন (ভি এম এস)-এর সভাপতি রূপা কুলকার্নি বলেন, 'গৃহস্থালী পরিচারক-পরিচারিকাদের সংগঠিত করার কাজে এই বিল এক বড় জয়।' কুলকার্নি আরও বলেন, পাস হওয়া আইনগুলি তাদের কাজে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া, তবে এখনও বেশ কিছু

কাজ বাকী আছে। প্রাথমিক ভাবে গোটা রাজ্যে কর্মরত এই ধরনের পরিচারকদের সংখ্যা নির্ণয় হবে বলে জানান কুলকার্নি।

ভি এম এসে নথিভুক্ত পরিচারক সংখ্যা ৪১ হাজার শুধু নাগপুরেই। তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করে কুলকার্নি অবশ্য জানান নাগপুরের জনসংখ্যা ৩০ লাখ। মহারাষ্ট্রের ৩৩টি জেলায় মোটামুটি এক লক্ষ করে পরিচারক-পরিচারিকা প্রতিটি জেলাতে কাজ করছে। আর সমগ্র মহারাষ্ট্রের জনসংখ্যা প্রায় দশ কোটি। তাহলে এমনটা বলাই যেতে পারে ৫০ লাখ থেকে এক কোটি পরিচারক এখন রাজ্যজুড়ে কাজ করছে।

জেলাভিত্তিক বোর্ডগুলোর এখন প্রাথমিক কাজ হবে সমস্ত পরিচারক দলের নাম নথিভুক্ত করানো — এমনটা বলেছেন রাজ্য সরকার। বোর্ডগুলো তাদের কাজ মার্চ থেকে শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বোর্ডের পদক্ষেপ শুরু হবে পরিচারকদের সন্তান-সন্ততিদের দুর্ঘটনার বীমা ও বৃত্তি পাইয়ে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে। গুরুতর অসুস্থতা বা শল্যচিকিৎসা, ধর্মীয় রীতি-রেওয়াজ এই সমস্ত বিষয়ে তাদেরকে প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে হবে। এই সমস্ত কিছুর জন্য একটা বিরাট আয়োজনের প্রয়োজন, তাই কেবিনেটের বাজেট পেশের লক্ষ্যে বিলের ধারাগুলো স্বচ্ছ হওয়ার দরকার বলে মনে করেছেন বিশেষজ্ঞরা। কুলকার্নির সামনে এখন মার্চের বিধানসভা বাজেটের অপেক্ষা আর ব্যস্ততা — পরিচারকদের বিশ্বাসযোগ্য সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য। সরকার মাসিক বেতন নির্ধারণ করার পর অবশ্য পরিচারক ও তার মালিক দু'জনকেই বোর্ডের পাওনাগন্ডা বুঝিয়ে দিতে হবে। বেতনের পরিমাণ ঠিক করা হলে বোর্ডের পাওয়া অংশের কিছু ভাগ পাবে প্রত্যেক পরিচারক। আর বোর্ড প্রয়োজনে পরিচারক-পরিচারিকাদের দেওয়া ভাগ থেকে খরচ করবে। জালিয়াতির ভূত মাথা থেকে সরাতে কুলকার্নি আশ্বাস দিয়েছেন, 'প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট পাসবই করা হবে এবং সুদের দায়িত্ব একটি নির্ধারিত সংস্থার হাতে থাকবে'। দক্ষিণ মুম্বাই এবং অন্যান্য শহরতলির সাথে বেতনের পার্থক্যের প্রশ্নটা অবশ্য থেকেই যায়। তবে কুলকার্নি চিন্তা করেছেন প্রত্যেকের সামর্থ্যের কথা মাথায় রাখা হবে।

বিভিন্ন দাবিতে পরিচারিকাদের সমাবেশ।

রাজ্য সরকারের এই বিল ব্যুমেরাং হয়ে গৃহকর্তারা বাড়ির কাজকর্মেই ওভারটাইম করতে চলেছেন কিনা সে বিষয়ে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে কুলকার্নি জানিয়েছেন, অধিকাংশ গৃহকর্তাই এরকম করবেন না, কারণ এতে পরিচারকদের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও বেশ কিছু সুবিধা আছে। মহারাষ্ট্র দেরী করে হলেও, তার সমাজ সেবার নমুনা দেখাতে শুরু করেছে। তবে এই ধরনের উদ্যোগ অঙ্কুরেই নষ্ট করে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবাংলার ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি যথেষ্ট। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলো এই ধরনের কাজে এগিয়ে থাকলেও মহারাষ্ট্র বিলম্বিত বাস্তবেও প্রধান বাধা পার করতে পেরেছে, এমনটাই দাবি করেছেন ভি এম এসের সভাপতি।

দলিত মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যেই প্রহৃত অনুসূচিত শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দলিত নেত্রী হচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই রাজ্যের রাজধানীতেই অনুসূচিত জাতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য অনুদানের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন ওইসব বিদ্যালয়েরই

লক্ষ্ণৌতে শিক্ষকদের ওপর লাঠিচার্জ করছে পুলিশ।

শিক্ষকরা। অনুদানের পরিবর্তে লক্ষ্ণৌ-পুলিশ তাদেরকে বেধড়ক পিটুনি দিল। চারদিক থেকে ঘিরে ধরে ভালোমতন লাঠিচার্জ করল পুলিশ গত ২৮ জানুয়ারির দুপুরে। এমনকী লাঠি-পেটার হাত থেকে রেহাই পাননি বয়স্ক ও মহিলা শিক্ষিকারাও। রয়েল হোটেল চৌরাস্তায় লাঠিচালনার ফলে ছুটোপুটি ও দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়। পুলিশ ১৪৫ জন শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ লাইনে নিয়ে যায়। আগের দু'দিন ধরে অনুসূচিত জাতি প্রাথমিক শিক্ষক সমাজ সমিতি-র প্রায় দেড়'শো জন শিক্ষক বিধান ভবনের সামনেই ধর্নায় বসেছিলেন।

গত ২৮ জানুয়ারি দুপুরে ধর্নাকারীরা পিছনের রাস্তা দিয়ে রয়েল হোটেল চৌরাস্তায় পৌঁছে রাস্তা অবরোধ করে প্রদর্শন শুরু করে। পাঁচমিনিটের মধ্যেই পুলিশবাহিনী ওখানে পৌঁছে শিক্ষকদের ওপর লাঠিচার্জ শুরু করে। লাঠির ঘায়ে আহত হয়েছেন — সুরেন্দ্র চৌরাসিয়া, সন্তলাল, রামচন্দ্র রাম, কৌশল কুমার, রাম বিলাস, প্রভাবতী পান্ডে, জয়ন্তী শর্মা, কেশরী তিওয়ারি, রমাশংকর, হরেন্দ্র প্রসাদ, পরমহংস এবং জিতেন্দ্রজীসহ মোট চল্লিশ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। এদিকে পুলিশ

সন্ধ্যায় সবাইকে ছেড়ে দেয়। শিক্ষক সমিতির সভাপতি মুন্নুরাম বলেছেন, তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। তাঁর অভিযোগ অনুসূচিত জাতি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহকে (আম্বেদকর বিদ্যালয়) অর্থ বন্টন তালিকায় সামিল করার জন্য সরকারের সমাজ কল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে জেলাশাসক, সমাজ কল্যাণ আধিকারিকদের কাছে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবুও ১৯৪৪ সালের পর একটিও বিদ্যালয়ের নাম অনুদান প্রাপক সূচীতে তোলা হয়নি। এর ফলে আর্থিক দৈন্যে ভুগছে স্কুল সহ শিক্ষকরাও। এই হল উত্তরপ্রদেশের দলিত নেত্রীর রাজত্বে অনুসূচিত জাতির লোকেদের প্রতি প্রত্যক্ষ আচরণ।

কেন্দ্র-রাজ্য ভিডিও কনফারেন্সিং শুরু হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে এবার ভিডিও কনফারেন্স পদ্ধতির মাধ্যমে কেন্দ্রের আর্থিক সাহায্যে চালু হওয়া লক্ষ্ণৌ নগর নিগম-এর প্রকল্পের প্রতি কড়া নজর রাখা হবে বলে জানা গেছে। একাজ কেন্দ্র সরকারের একজন অফিসার নিয়মিত দেখ-ভাল করবেন। এজন্য ব্যবস্থার যাবতীয় উপকরণ ইতিমধ্যেই নগর নিগমের কাছে পৌঁছে গেছে। শুধুমাত্র বাকী রয়েছে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে একজন টেকনিশিয়ান এসে তা চালু করে দেওয়া। এই বিশেষজ্ঞের খোঁজ চলছে গত আটমাস ধরে। নগর নিগমও কেন্দ্রকে ব্যবস্থা শুরু করার জন্য পত্র দিয়েছে। চালু হলেই দেশের রাজধানীর সঙ্গে যে সকল ক্ষেত্র ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত তাও একীকৃত হবে। গত বছরের জুলাই মাসে কেন্দ্র সরকার-এর শহরী গরীবি উন্মূলন মন্ত্রক ওই সব সরঞ্জাম পাঠিয়েছে। আবার ওই সকল যন্ত্রপাতি ইউনাইটেড নেশন ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট বিনামূল্যে পাঠিয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত কেন্দ্র সরকারের 'জহরলাল নেহরু আর্বান (শহর) রিনিয়াল মিশন' যোজনার অধীনে লক্ষ্ণৌ শহরে সুয়ারেজ, পানীয় জল এবং আবর্জনা পরিশ্রুতকরণ প্রকল্পে কাজ চলছে। এতদিন পর্যন্ত রাজ্যের কোনও অফিসার বা পত্রের মাধ্যমে কেন্দ্র সরকারকে খচরা-খরচ পাঠানো হত। সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। নতুন ব্যবস্থা চালু হলেই কেন্দ্র রাজ্যের কাছে প্রশ্ন করে সব জানতে চাইবে। রাজ্যের অফিসারদেরও প্রকল্প সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

বিষাক্ত কালনাগ আই এস আই

কিরণ শঙ্কর মৈত্র

।। আট ।।

২০০২ সালের ২২ জানুয়ারি 'দ্য হিন্দুস্থান টাইমস্'-এর (দিল্লী সংস্করণ) একটি সংবাদে দেখা গেছে যে, আই এস আই গ্রুপ ভারতে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের জন্যে হিজব্ উল-মুজাহিদিন-এর মতো সংস্থাকে বছরে ৬০-৭০ কোটি টাকা দেয় ।

জামা মসজিদ এলাকায় মীনা বাজারে মোহাম্মদ মুস্লিম ওরফে গুল্লু নামে এক ভারতীয় নাগরিকের একটি গারমেন্ট শপ ভারতে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। টাকা পয়সা তার মাধ্যমেই আসে। "তার কোড নেম শর্মা। পাকিস্তান থেকে এই অর্থ এনে সে জম্মু-কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভাগ করে দেয়" — একথা স্বীকার করেছে মুস্তাক আহমেদ ওরফে হায়দার আলি নামে এক অভিযুক্ত।

আরেক অভিযুক্ত যসবিন্দার সিং, এক আফগান নাগরিক, ভারতে এসেছিল ১৯৯৭ সালে। কাজীর হয়ে ভারতে সে নানা ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে, সংগৃহীত অর্থ গুল্লুকে তার দোকানে দেয়। বিনিময়ে প্রতি এক লাখ টাকার জন্যে সে কমিশন পেত পাঁচ'শো টাকা।

২৭ জানুয়ারি আশিক আলি ওরফে শাহনিল তাহির (২১) নামে এক আই এস আই এজেন্টকে গ্রেপ্তার করা হয় নিজামাবাদ জেলা থেকে (অন্ধ্রপ্রদেশ) যখন সেই-মেলে ডিফেন্স ইনস্টলেশনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাকিস্তানে পাঠাচ্ছিল। পাকিস্তানের কাসিমাবাদ তহশীলের অধিবাসী আশিকের কাছ থেকে পাওয়া গেছে ই-মেল প্রিন্ট আউট, ডায়েরিতে নানা টেলিফোন নম্বর, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার যন্ত্রাদির প্রতিষ্ঠানের ম্যাপ ও ফোটোগ্রাফ ইত্যাদি।

ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়াশুনা করার পরে সিন্ধু ক্যান্টনমেন্টের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে ভর্তি করা হয় আশিককে (এপ্রিল, ২০০১)। তাকে ৪০ দিন ট্রেনিং দেওয়া হয় মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে। আটারি হয়ে তাকে পাকিস্তানি পাসপোর্ট দিয়ে ভারতে পাঠানো হয় ২০০১ সালের জুন মাসে। তাকে, আহমেদিয়া সম্প্রদায়ে ভর্তি হয়ে, ডিফেন্স সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছিল, বিশেষ করে সেকেন্দ্রাবাদের ৫৪ নং ডিভিসনের।

একবার দিল্লী থেকে হায়দরাবাদ আসবার পথে তার সঙ্গে ই এম ই- সেন্টার- সেকেন্দ্রাবাদের একজন আর্মি জওয়ানের আলাপ হয়। এই সিপাহি যে সেকেন্দ্রাবাদ ক্যান্টনমেন্টের প্রতিরক্ষা বিভাগের বহু জায়গার স্কেচ, ম্যাপ ও তথ্য সংগ্রহ করে ই-মেলে নিয়মিত পাকিস্তানে পাঠাত।

আরেকজন আই এস আই এজেন্ট, রয়িস জান হায়দরাবাদে থেকে ভারতের মিসাইল প্রোগ্রাম, অগ্নি, ত্রিশুল ও পৃথ্বীর প্রস্তুতি এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের বহু তথ্য জোগাড় করে পাঠাত।

পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, রয়িস জানের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে ধৃত (৫ জানুয়ারি, ২০০১) মোহাম্মদ দিলসাদ নামে আরেকজন আই এস এস এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। শিলিগুড়ির পুলিশ আসিফ আলির সঙ্গে দিলসাদের যোগাযোগের আরও তথ্য জানবার জন্যে হায়দরাবাদ থেকে তাকে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিল।

জানুয়ারির প্রথমে শিলিগুড়িতে ধৃত আই এস আই এজেন্ট মোহাম্মদ দিলশাদকে জিজ্ঞাসাবাদে আই এস আই-এর কর্মজাল ও কর্মব্যাপ্তি ও গভীরতা সম্পর্কে খবর জানা যায়। তার স্বীকারোক্তির ফলে আবদুল বারি 'পানওয়ালা' নামে দিল্লী থেকে একজন হাওয়ালা ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছে আই এস আই কীভাবে এদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রেবিস্তৃত ও ব্যাপ্তি লাভ করেছে সে-সম্বন্ধে উচ্চকিত তথ্য প্রকাশ পায়। পার্লামেন্ট আক্রমণের পরে ভারত যেসব ব্যবস্থা নিচ্ছে, তার প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে পাকিস্তানের পূর্ণ অবগতি রয়েছে।

ইতিমধ্যে হাজারিবাগে ২৮ জানুয়ারি জাহিদ ও সালিম নামে দু'জন পাকিস্তানি পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা যায়। কেন্দ্রীয় গৃহসচিবের বক্তব্য অনুযায়ী, কলকাতায় আমেরিকান সেন্টারে হামলা করার সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে সন্দেহ করা হয়।

একটি আই বি সূত্রে জানা যায় — দিল্লী পুলিশ আসিফ রেজা, আরশাদ এবং অনিতা দাসকে গ্রেপ্তারের পরে আই এস আই-এর কর্ম-পরম্পরা, সন্নিবেশ ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানা গেছে। আই এস আই এদেশের অনেক অপরাধীকে তাদের কর্মকান্ডে নিযুক্ত করছে। এই অপরাধীরা ছড়িয়ে আছে আগ্রা, নালন্দা, কলকাতা, মুম্বাই, ঝাড়খণ্ড, গুজরাটের বিভিন্ন জায়গায়। অনেক অপরাধী অপহরণ ও মুক্তিপণ সংগ্রহে ব্যস্ত। এজন্যে আই এস আই-কে কোনও অর্থ ব্যয় করতেও হয় না। আই এস আই অর্থ ব্যয় করে তাদের নিজস্ব

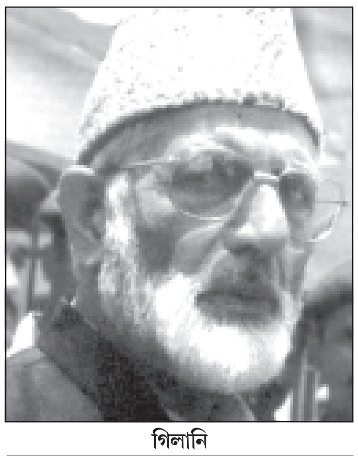

গিলানি

ক্যাডার ও এজেন্টদের জন্যে। তাদের ট্রেনিং দিতে এবং অস্ত্র-শস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ ক্রয় করতে।

নেপালে থেকে আই এস আই এজেন্টরা যে কীভাবে ভারতের ক্ষতি করছে তার খবর মাঝে মাঝেই পাওয়া যায়। আমেরিকায় ১১ সেপ্টেম্বর ঘটনার পরে আলকায়দা খুবই প্রকাশের আলোকে। আপাতত মনে হয়, খুবই নিরীহ ও নির্দোষ এমনই একটি মাদ্রাসা, ভারত-সীমান্তের কাছে কপিলাবস্তু— সিরাজুল উলুম। এর সঙ্গে আল-কায়দার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক — মৌলানা আবদুল্লা মাদানি এবং মৌলানা আবু বকর্ নাদ্ভির সংযোগে যারা রবিতা ইসলামিক ওয়ার্ল্ড-এর এজেন্ট। মাদ্রাসাটিকে যেমন নানাকাজে ব্যবহার করে আই এস আই, তেমনি আল-কায়দাও। প্যান ইসলামিক রবিতা ইসলামিক ওয়ার্ল্ডের ভূতপূর্ব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জেনারেল পারভেজ মুশারফ। এটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে আমেরিকা। নিষিদ্ধ ঘোষণা করার অব্যবহিত আগে আমেরিকার সরকার মুশারফকে পরামর্শ দিয়েছিলেন এই সংস্থা থেকে পদত্যাগ করতে, অস্বস্তিকর অবস্থা এড়াবার জন্যে।

অন্য রাজ্যের যেসব পলাতক অপরাধী ইউনাইটেড আরব এমিরেটস-এ আশ্রয় নেয়, তাদের বহিস্কারে তারা তেমন আগ্রহী নয়। ভারতের নাগরিকদের ব্যাপারেও এমন ঘটনা আগে ঘটেছে। ওদেশে যারা টাকা ঢালতে পারে তাদেরই সুস্বাগতম জানানো হয়। তাই দাউদ ইব্রাহিম এবং তার চ্যালা- চামুন্ডারা বহাল তবিয়তে গা ঢাকা দেয় ওই দেশে, যখনই কোনও অসুবিধা দেখা দেয়। কিন্তু কলকাতায় আমেরিকান সেন্টারে সন্ত্রাসবাদীদের হানা অবস্থায় একটু পরিবর্তন আনে।

> “ গিলানির হায়দারপোরা বাসস্থান থেকে পাওয়া গেছে ১০.২৫ লাখ নগদ টাকা-১০,০০০ ডলার, জমি ও অলঙ্কার কেনার কাগজ-পত্র, একটি হীরক খচিত ঘড়ি-যার উপরে মুদ্রিত রয়েছে "পাকিস্তান সরকারের তরফ থেকে", একটি টাটা সুমো গাড়ি, দুটি অ্যাম্বাসাডার গাড়ি — হিসাববিহীন সূত্র থেকে কেনা। দিল্লীতে দুটি বাড়ি ইত্যাদি। ”

ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন-এর ডিরেক্টর রবার্ট মিউলে তখন ভারতে ছিলেন। তাঁকে বলা হল যে, আফতাব আনসারি আমেরিকান সেন্টারে হামলার দায়িত্ব স্বীকার করে কলকাতায় ফোন করেছিল। সেই ফোনের সন্ধানে দেখা গেল — সেটি করা হয়েছে দুবাই থেকে। আমেরিকা এ-কথা ইউ এ ই-কে জানিয়ে দেয় এবং পরের দিনই আফতাবকে গ্রেপ্তার করা হয়, যখন সে পাকিস্তানে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। মিউলের ভারত থেকে ফিরবার পথে দুবাই যান এবং শাসন কর্তৃপক্ষকে সন্ত্রাসবাদীদের সম্বন্ধে সাবধান করে দেন। ভারতের সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইন্টেলিজেন্স আফতাবকে দিল্লী নিয়ে আসে। তাকে ১০ ফেব্রুয়ারি আইনানুগ গ্রেপ্তার করা হয়। তার সঙ্গে আরও আনা হয় রাজু শর্মা ওরফে রাজেন্দ্র কুমার আনন্দকোটকে। কলকাতার ঘটনায় সে কতোটা জড়িত তা তখনও ভালোভাবে জানা না গেলেও, বিহার ও গুজরাতে অনেক অপহরণের ব্যাপারে সে জড়িত বলে সন্দেহ করা হয়।

সি বি আই খুব ভালো করে বুঝতে পারে, আই এস আই-এর সঙ্গে এবং জইশ-এ-মহম্মদ ও তার নেতা ওমর শেখের সঙ্গে আফতাবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা।

জিজ্ঞাসাবাদের পরে আফতাবের কাছ থেকে আই এস আই সম্বন্ধে বহু কথা জানা যায়। ১৯৯৯ থেকে সিনিয়র আই এস আই কর্মকর্তারা তার সঙ্গে অন্তত পাঁচবার দেখা করেছে— পাকিস্তান ও দুবাইতে। যে ১৪টি কোম্পানী সে খুলেছে সে সবই তাদের সহায়তায়। ভারতে জামিনে মুক্ত হয়ে ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানে যাবার পরেই আই এস আই-এর সঙ্গে তার যোগাযোগ। সাত জন আই এস আই অফিসারের নামও সে করেছে— তাদের একজন ব্রিগেডিয়ার র‍্যাঙ্কের। সে জানায় আমেরিকান সেন্টারে হামলার পরিকল্পনায় ছিল দু'জন আই এস আই কর্মকর্তা — ব্রিগেডিয়ার ইউসুফ ও ব্রিগেডিয়ার খান, যে সরবরাহ করেছে "Men and Means" — লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য উপকরণ। তারা সবাই সি আই ডি হেডকোয়ার্টার্স ভবানী ভবন ও রাইটার্স বিল্ডিং-এর কথাও ভেবেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমেরিকান সেন্টারই লক্ষ্য হয়। বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ আবদুল করিম তুন্ডার নামও আফতাব

মুশারফ

কেসের তদন্তে উঠে আসে। চার বছর আগে দিল্লীতে বোমা বিস্ফোরণ করে তান্ডব সৃষ্টি করেছিল সে। অন্তর্ঘাতী কাজের জন্যে সে বাংলাদেশ থেকে অনেককে নিয়ে আসত।

যাট বছরের ছেটখাট তুন্ডার একটি হাত নেই। সে আহমেদাবাদের একটি ফ্যাক্টরিতে কাজ করত। হোমিওপ্যাথিতে তার জ্ঞানের জন্যে লোকেরা তাকে হাকিমজী বলত। বোমা বিস্ফোরণের ৪০ টি কেসে সে জড়িত। সে এবং তার সঙ্গী নিসার আহমেদ শেখ বিস্ফোরকের সঙ্গে সঙ্গে পটাসিয়াম ক্লোরেট সরবরাহ করেছে — ১৯৯৩ সালে শিখ উগ্রবাদীদের। ট্রেনে অনেক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তুন্ডা। ১৯৯৭ সালে দিল্লীর ২৪টি বিস্ফোরণে তার সঙ্গি নিসারের জড়িত থাকার কথা সন্দেহ করে পুলিশ। তুন্ডার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আই এস আই এবং লস্কর-এর। সে পাকিস্তানে গিয়েও উগ্রপন্থী ট্রেনিং দিয়েছে।

আই এস আই এজেন্ট হিজব্-এ-ইসলামীর কর্মী মোহম্মদ হানিফ কালসীকে দিল্লী পুলিশ ১৩ ফেব্রুয়ারি গ্রেপ্তার করে, যখন সে ৮ কেজি আর ডি এক্স নিয়ে ওল্ড দিল্লী রেলওয়ে স্টেশনের কাছে একটি ব্রিজকে উড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল। তার কাছে পাওয়া যায় দুটি ডিটোনেটর। একটি ফিউজ তার এবং দুটি কর্ডেক্স তার। ফেব্রুয়ারির প্রথমে এসে ওল্ড দিল্লীর একটি গেস্ট হাউসে সে ছিল। বিস্ফোরক পদার্থগুলি সে পায় একদিন আগে, ১২ ফেব্রুয়ারি।

কাশ্মীর ও দিল্লীর এগারোটি জায়গায় ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে হানা দেবার পরেই, ৯ জুন ভূতপূর্ব অলপার্টি হুরিয়ৎ কনফারেন্স-এর চেয়ারম্যান এবং জামাত-এ-ইসলামির নেতা সৈয়দ আলি শাহ্ গিলানি এবং তার দুই জামাতা আলতাফ আহমদ শাহ ও ইফ্তিকার গিলানিকে গ্রেপ্তার করা হয় প্রিভনেশন অফ টেররিজম্ অ্যাক্ট-এ। গিলানিকে রাঁচির সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। গিলানি এবং শাহ আই এস আই থেকে প্রচুর অর্থ লাভ করেছে বলে অভিযোগ। দিল্লী থেকে অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট-এ ইফ্তিকারকে গ্রেপ্তার করা হয়। গিলানির হায়দারপোরা বাসস্থান থেকে পাওয়া গেছে ১০.২৫ লাখ নগদ টাকা-১০,০০০ ডলার, জমি ও অলঙ্কার কেনার কাগজ-পত্র, একটি হীরক-খচিত ঘড়ি-যার উপরে মুদ্রিত রয়েছে "পাকিস্তান সরকারের তরফ থেকে", একটি টাটা সুমো গাড়ি, দুটি অ্যাম্বাসাডার গাড়ি — হিসাববিহীন সূত্র থেকে কেনা। দিল্লীতে দুটি বাড়ি ইত্যাদি।

সংবাদ সূত্রানুযায়ী ইফতিকার গিলানি স্বীকার করেছে যে, সে একজন পাকিস্তানি আই এস আই এজেন্ট। ভারতীয় সেনাবাহিনীর গতিবিধি সম্বন্ধে 'ক্লাসিফায়েড' তথ্য সে আই এস আই-কে জানাত। হুরিয়াত এবং পাকিস্তানি আই এস আই-এর সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া যায় বিশেষ করে তিনটি টেলিফোন কথাবার্তা শুনে (ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল, ২০০২)। এই বার্তালাপ হয়েছিল লন্ডনস্থিত কাশ্মীরের উগ্রবাদীদের জন্যে অর্থসংগ্রহকারী আয়ুব ঠাকুর এবং শ্রীনগরবাসী দুখ্তারান-এ-মিল্লাৎ এর আসিয়া আন্দ্রাবি'র মধ্যে।

আয়ুবের সম্পর্ক রয়েছে হিজ্ব-উল-মুজাহিদিন এবং জামাত-এ-ইসলামির সঙ্গে। এই গুরুত্বপূর্ণ সংযোগটিকে আই এস আই ব্যবহার করেছে ভারতে সন্ত্রাসবাদীদের জন্যে অর্থ সরবরাহে। এই পথে আই এস আই মাসে ৫ থেকে ১০ কোটি টাকা বিভিন্ন ভাবে পাঠাত। (চলবে)

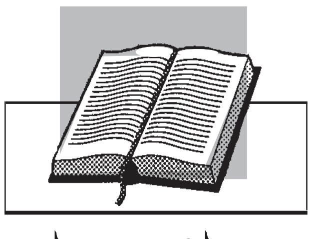

পুস্তক প্রসঙ্গ

জেহাদ-এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

শিবাজী গুপ্ত

এই গ্রন্থের অবতরণিকা শুরু হয়েছে “জেহাদ ও ইসলামের স্বরূপ জানতে হলে এই বই পড়তে হয়” — এই কয়টি কথা দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে এই কয়টি কথাই এই গ্রন্থের নির্যাস। এ ধরনের বই কদাচিৎ হতে পাড়ে। কিন্তু পড়লে এক নাগাড়ে না পড়ে ছাড়া যায় না।

ডাঃ মৃণালকান্তি দেবনাথ তাঁর সুখময় ও দুর্যোগময় কৈশোর ও বাল্য জীবনের কাহিনী অত্যন্ত নিরলঙ্কার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। সুখ ছিল প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা বিধাতার দান, আর দুঃখ ছিল নরাকৃতি নরপশুদের হাতে তৈরি। সে দুঃখ শুধু একা তাঁর নয়, তাঁর মতোই অগণিত বালকের দুঃখের কাহিনীই যেন তাঁর কলম থেকে উৎসারিত হয়েছে।

কলকাতায় ‘জেহাদ ও উদ্বাস্তু ছেলে’-র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে লেখক (মাঝখানে) ও অন্যান্য

ধর্মান্ধতার বশবর্তী হয়ে একটি মাত্র লোকের উস্কানিতে হাজার হাজার মানুষ কেমন করে মুহূর্ত মধ্যে বোধবুদ্ধি বিচার ও বিবেকহীন অমানুষ বর্বরে পরিণত হতে পারে, তার প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী ছিলেন ডাঃ দেবনাথ। তাদের সেই হিংস্র চাহনী ও চেহারা কোনও মাংসাষী হিংস্র জানোয়ারের সঙ্গেই তুলনীয় নয়। ডাঃ দেবনাথ অকস্মাৎ অজান্তে সেই হিংস্রতার শিকার হয়েছিলেন। কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে সভ্যতার আলো থেকে ছিটকে যেন অসভ্যতা বর্বরতার অন্ধকার গহ্বরে নিপাতিত হয়েছিলেন। এক মহানুভব বিধর্মী পরিবারের মানবিক উদারতায় তাঁর নিজের জীবন রক্ষা পেলেও চোখের সামনে নির্দোষ জীবন্ত মানুষকে পুড়ে পুড়ে খাক হতে দেখেছেন, ধর্ষিতা মা-বোনের কাতর ক্রন্দন স্বকর্ণে শুনেছেন, দোকান-বাড়ি-দেবালয় দাউ দাউ করে জ্বলতে স্বচক্ষে দেখেছেন। সেসব বিভীষিকাময় দৃশ্য তিনি নিপুণ হাতে বর্ণনা করেছেন।

আবার নিঃসম্পর্কীয় অপরিচিত আরেক সর্বহারা কিশোর যেন বন্ধুরূপে ভগবান মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে তাকে ডুবন্ত অবস্থা থেকে টেনে তুলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে রক্ষী হিসাবে পাশে দাঁড়িয়েছে। তারপর নিজের মেধা, নিষ্ঠা এবং বর্তমানে বিরলদৃষ্ট শিক্ষকদের সাহায্য ও ভালোবাসায় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের সোপান তৈরি করেছেন।

কোটিকে গুটিক হলেও বিধর্মীদের মধ্যে দু’এক জনের সদাশয় ব্যবহার তিনি যেমন পেয়েছেন, তেমনি স্বধর্মী বিশ্বাসভাজন আত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতা ও নিমকহারামি ব্যবহার যে তাঁর নিজের ও তাঁর পরিবারের অশেষ দুঃখের কারণ হয়েছে, সেসব শয়তানদের মুখোসও উন্মোচন করেছেন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাঁর অসামান্য সাফল্যে যে সমস্ত সাধারণ লোক স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছে, শোভাযাত্রা করে উল্লাস প্রকাশ করেছে, তাদের সেই নিঃস্বার্থ ভালোবাসার মর্যাদা দানেও তিনি কুণ্ঠিত হননি।

যারা দাঙ্গা কি জিনিস জানে না, দাঙ্গার কবলে কখনো পড়েনি তারা

একজন উদ্বাস্তু বালকের এই আংশিক আত্মজীবনী পাঠ করে নিজেদের অনুরূপ পরিস্থিতিতে রেখে বিচার করলে বুঝতে পারবেন, কি দুঃখে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা সাতপুরুষের ভিটামাটি, সাজানো ঘরবাড়ি, জীবিকা নির্বাহের স্থায়ী সংস্থানের মায়া কাটিয়ে জিঘাংসাপরায়ণ বিধর্মী প্রতিবেশির কবল থেকে মান সম্মান বাঁচাতে একবস্ত্রে ভিন্ন রাষ্ট্রে অনিশ্চি তের পথে পাড়ি দিয়েছে, দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও দেবে।

গ্রন্থখানি ১৯৬৪ সালের খুলনার দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা। পূর্ব পাকিস্তান তথা অধুনা বাংলাদেশের নোয়াখালি, ত্রিপুরা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ফরিদপুর, ময়মনসিং, রাজশাহী, পাবনাসমেত ১৭টি জেলার হিন্দু বিরোধী দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে এ ধরনের এক একটি বই লেখা হলে সেগুলি বাংলায় মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ও জেহাদী চরিত্রের এক সামগ্রিক ও তথ্যনিষ্ঠইতিহাস বলে গণ্য হতো। কিন্তু পশ্চি মবঙ্গের বুদ্ধি ভ্রষ্ট বুদ্ধি জীবীরা উদ্বাস্তুদের জন্য মায়াকান্না কাঁদলেও কেন তাদের উদ্বাস্তু হতে হল, সে সম্পর্কে মুখ খুলতে ও কলম ধরতে নারাজ। কারণ টুপি-দাঁড়ির কাছে তাদের টিকি বাঁধা যে!

তরুণদের পড়া উচিত এই গ্রন্থ

ডঃ রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

অনেক নতুন বই হাতে পাই। ভালো লাগে, কিন্তু বেশির ভাগই পড়ে ভালো লাগে না। মন তৃপ্ত হয় না। কিন্তু ডাঃ মৃণালকান্তি দেবনাথের ‘জেহাদ ও উদ্বাস্তু ছেলে’ বইটি হাতে পেয়ে যেমন ভালো লাগল, তেমনি পড়েও ভালো লাগল। এক কথায় অসাধারণ। কোথায় অসাধারণত্ব? লেখকের সত্যনিষ্ঠায়, সাহসিকতায়, প্রকাশের বলিষ্ঠতায়। বইটির দুটি অংশ। একদিকে হযরতবাল মসজিদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে মুসলমানদের হিন্দু নিধন কাহিনীর ইতিবৃত্ত; অন্যদিকে একটি উদ্বাস্তু ছেলের বড় হয়ে ওঠার সাহসিক কাহিনী। প্রথম অংশ এক রাজনৈতিক ও সামাজিক দলিল;অন্য অংশ আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস।

প্রথম অংশের বিভীষিকা ও দ্বিতীয় অংশের সংগ্রাম পাঠককে টেনে ধরে রাখে। এটাই প্রকৃত গ্রন্থের গুণ। টানটান উত্তেজনা নিয়ে বইটি পড়েছি। দাঙ্গার ভয়াল রূপ প্রত্যক্ষ করিনি। কিন্তু ডাঃ দেবনাথের বর্ণনায় তা এমন বাস্তব হয়ে উঠেছে যে, মনে হচ্ছিল আমি যেন সেই জায়গাতেই ছিলুম। উত্তেজনায় মাঝে মাঝে দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট চেপে ধরেছি। মেরুদণ্ড শক্ত করে বসেছি। বইটির এই অসাধারণ গুণ পাঠককে অভিভূত করবেই।

পাঁকেও পদ্ম ফোটে। মৃণাল তা গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে দেখিয়েছেন। আমাদের বাঙালি তরুণদের এই গ্রন্থ পড়া উচিত। অলস রাজনীতিসর্বস্ব বাঙালি শরীরে এই গ্রন্থ টনিকের কাজ করবে। এ গ্রন্থে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, প্রেম-প্রতাপ, হিংসা-রিরংসা, ধ্বংস-আশ্রয়, জীবন-মৃত্যু, নিকেত-অনিকেত, জল-স্থল, রাগ-অনুরাগ, পশুত্ব-মনুষ্যত্ব সব একাকার হয়ে গেছে। মৃত্যুকে অতিক্রম করে দাঁড়াল জীবন। এক সুন্দর জীবন, সার্থক জীবন। জেহাদ এ জীবনকে ধ্বংস করতে পারে না। রাজনীতি এ জীবনকে কলুষিত করতে পারে না। বইটি তাই শেষ পর্যন্ত এক জীবন শিল্পীর আত্মকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জীবন অনুকরণীয়। তাই আদরণীয়।

আমি লেখককে শ্রদ্ধা জানাই।

প্রাক্তন অধ্যাপক বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

‘জেহাদ ও উদ্বাস্তু ছেলে’
ডাঃ মৃণালকান্তি দেবনাথ।
প্রাপ্তিস্থান ঃ শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, বিধান সরণী, কল-৬, মূল্য-১০০.০০

চিঠিপত্র

পরিবর্তনের ইঙ্গিত

অবশেষে যেটা ভাবা হয়েছিল, সেটাই হল, নন্দীগ্রামের সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ ভোটের বাক্সে রাজ্য বামফ্রন্ট নেতাদের মুখের মতো জবাব দিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দানবীয় শিল্পনীতি যে ভুলে ভরা তা সকলে ক্রমান্বয়ে বললেও বুদ্ধ দেববাবু মানেননি। তাই মানুষের ক্রোধ এবং ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে ঘটেছে।

একথা ঠিক যে, গত দু 'বছরে শিল্পায়নের নামে সি পি এমের অত্যাচারের ফলে সেখানকার মানুষ কি রায় দেন তা দেখার জন্য উৎসাহী ছিলেন — শুধু পশ্চি মবঙ্গ নয় গোটা দেশ। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, ২০০৬ সালে সি পি আই প্রার্থী মহম্মদ ইলিয়াস ওই কেন্দ্রে ৬৯,৩৭৬টি ভোট পেয়েছিলেন। তার মধ্যে যে অনেক জলমেশানো ছিল, তা আজ পরিস্কার। মাত্র ৪৮২১ ভোটে হেরে যান তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আবু সুফিয়ান। সি পি আই প্রার্থী মহম্মদ ইলিয়াসের বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ ওঠায় তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। অবশ্য তার কিছু আগেই ঘটে গেছে নন্দীগ্রামে নারকীয় তান্ডব। ভোটে ৪০ হাজার ব্যবধানে বামফ্রন্ট প্রার্থীর হার একটা বিরাট অর্থ বহন করে। মানুষের রোষ কোন পর্যায়ে পৌঁছালে এত বিশাল ব্যবধানে একজন প্রার্থী হারতে পারেন। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে "গায়ে মানে না আপনি মোড়ল।" ঠিক সেটাই ঘটেছিল সি পি এম সদস্য লক্ষণ শেঠের ক্ষেত্রে। তার ভাষা এবং চলন-বলন সহ্যের শেষ সীমা ছড়িয়ে যাচ্ছিল। আশা করি, তাঁর পা মাটিতেপড়বে। সুজাপুরেও প্রত্যাশা মতো বিরোধী দল ভাল ফল করেছে। এসবই পরিবর্তনের ইঙ্গিত। আসলে 'আমরা-ওরার' ফসকা গেরোয় বুদ্ধ দেববাবুরা মানুষের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। প্রশাসন আর পুলিশ দিয়ে গায়ের জোরে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা যায় না। তাই সামান্য স্কুল-কলেজ নির্বাচনেও সি পি এমের ধস নামছে।

সুশান্ত কুমার দে, গ্রিন পার্ক, কলকাতা-১০৩

কলকাতা পুরসভার করের বোঝা

আমি দীর্ঘ ৪০ বৎসর প্রথমে পুরানো সাউথ সুবারবান মিউনিসিপ্যালিটি বেহালা (এখন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত) ট্যাক্স কালেকশন এ্যাসেসমেন্ট ও পরে লাইসেন্স বিভাগে ইন্সপেক্টর পদে থেকে গত ৩১।১।২০০০ সালে অবসর গ্রহণ করেছি। বর্তমানে আমি পর্ণশ্রী পল্লীর কাছে ২৭-ই, সাগর মান্না রোড, ফ্ল্যাট-১০১, ফার্স্ট ফ্লোর, ওয়ার্ড ১৩২-এ, বসবাস করছি। এই ফ্ল্যাটটি আমার কন্যা শ্রীমতি রুমা চক্রবর্তী ও আমার নামে গত ৩।১১।২০০৮-এ রেজিস্ট্রেশন করা হইয়াছে। নাম মিউটেশন ও ফ্ল্যাটটি এ্যাসেসমেন্ট করার জন্য আমার আবেদন করার পূর্বেই হঠাৎ গত ১০।১২।২০০৮ এ্যাসেসর কালেক্টর (এস. এস. ইউনিট) স্বাক্ষরযুক্ত একটি ভ্যালুয়েশন হিয়ারিং, নোটিশ আসে, তাতে উল্লেখ করা আছে পারশন্ লায়েবল্ টু পে ট্যাক্স দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ফ্ল্যাট-১০১ ফ্লোর ফার্স্ট , ৩০, সাগরমান্না রোড, অ্যাসেসি নং ৪১১৩২১০০৪০১৯ অ্যানুয়েল ভ্যালুয়েশন নোটিশ নং, ৯৩৮৫৫ টাঃ ৬৮৪০ আমাকে হিয়ারিং-এ উপস্থিত থাকার জন্য ১০।১।২০০৯ বলা হইয়াছে। প্রথম দিনেই নোটিশটি পাইয়া হতবাক হইয়া যাই, কারণ আমি সবেমাত্র দলিল পাইয়াছি এবং "দুই নামে দলিল" এবং আমার কোনও আবেদন করার পূর্বেই এই নোটিশ পাওয়াতে। আমি কলকাতা পুরসভার তারাতলা (সাউথ সুবারবান ইউনিট) অফিসে যাই বিষয়টি জানাতে। সেখানে সমস্ত পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের কাছে একটু সহযোগিতা ও ভালবাসা কিছুই পেলাম না। আমার বক্তব্য ১টি শয়নকক্ষ সমেত ৪৮৭ বর্গফুটের ৬৮৪০ ভ্যালুয়েশন কীভাবে ধরা হইল, আমার ফ্ল্যাটটি কেউ একবার দেখতে এলেন না, যেখানে দুটি নামে দলিল তাও না দেখে কীভাবে একটি নামে এইভাবে তড়িঘড়ি করে ট্যাক্স ধার্য করার কি যুক্তি বুঝতে পারলাম না। আমি যথারীতি হিয়ারিং নোটিশটি লইয়া গত ১০।১।২০০৯ হিয়ারিং অফিসারের সঙ্গে দেখা করি এবং আমার সমস্ত পরিচয় দিই, আইডেন্টি কার্ডটিও দেখাই। তিনি আমার কোনও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, অ্যানুয়েল ভ্যালুয়েসন করলেন ৫২৬০ (পাঁচ হাজার দুইশত ষাট) অর্থাৎ টাঃ ৫২৯/ কোয়াটার্লি ট্যাক্স। আমি ১৫০৯ (এক হাজার পাঁচশত নয় টাকা) ২য় কোয়ার্টার ২০০৮-২০০৯ ও তৃতীয় ও চতুর্থ ল্যান্ডলর্ড শ্যামলী মান্নার নামে জমা দিই ১০।১।২০০৯। আমার জিজ্ঞাসা, আমার ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন সেল ৩।১১।২০০৮ অর্থাৎ তৃতীয়কোয়ার্টার ২০০৮-২০০৯ না ধরিয়া কেন ২য় কোয়ার্টার ২০০৮-২০০৯ ধরা হল?

কলকাতার মহামান্য মেয়র শ্রী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে প্রশ্ন — দীর্ঘ ৪০ বৎসর এই পুরসভায় চাকুরি করে এসে এই জীবনসন্ধ্যায় পুরসভার অফিসারদের বিরাট অঙ্কের পুরকর ধার্য করলে কি পুরস্কৃত করা হল? এই করের বোঝা থেকে পরিত্রাণের কি উপায় এবং যাহাতে আমি কর দিতে পারি।

দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, (অবসর প্রাপ্ত ইন্সপেক্টর) কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, এস এস ইউনিট, বেহালা, কলকাতা-৩৪

প্রজাতন্ত্রের ভাষা

বেশ কিছুদিন ধরে দেখছি, ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগে কতিপয় রাজনীতিবিদরা ইতরামির পরিচয় দিচ্ছেন। এই ভাষা প্রজাতন্ত্রের ভাষা না দলীয় ভাষা — বুঝে ওঠা যাচ্ছে না। ইতরশ্রেণী এই ভাষা প্রয়োগ করলে আমরা সহজে ভর্ৎসনা করি — জ্যাঠামি করে বসি। রাজনীতিবিদ্‌দের বিরুদ্ধে কী করব? সমাজের মানুষের ভালো-মন্দের ঠিকা নেওয়া গদির কারবারীদের ভাষার কাছে কী আমরা নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করে বসবো?

প্রশ্ন জাগে, হঠাৎ করে এই কর্দমাক্ত-কদর্য ভাষার যত্রতত্র প্রয়োগ হচ্ছে কী করে? এর নেপথ্যে কি কোনও দুরভিসন্ধি, ষড়যন্ত্র বা কু-পরিকল্পনা কাজ করছে? পেটোয়া সারস্বত সমাজের একাংশ কেন নিশ্চুপ? এ স্বেচ্ছাকৃত নীরবতা কী তথাকথিত রাজনীতিবিদদের প্রশ্রয় দিচ্ছে না? ইন্ধন যোগাচ্ছে না?

শখের প্রজাপালক রাজনীতিবিদ্‌রা সম্ভবত এতসব ভাবেন না। আর ভাববার দরকার-ই বা কী! ছলে-বলে-কৌশলে মসনদ দখলই তাঁদের লক্ষ্য। সেখানে ভাষার ব্যবহার, চেতনার প্রয়োগ ঠিক হল কী হল না তা নিয়ে তাঁদের কিছু যায় আসে না।

এর দরুন জনরোষ বাড়ছে। জনক্ষোভ বাড়ছে। স্বার্থকেন্দ্রিক ধবংসাত্মক মানসিকতা তৈরি হচ্ছে। এটা সুস্থ চিন্তা-সৃজনশীল মানসিকতা তৈরির পথে অন্তরায় হচ্ছে। শখের রাজনীতিবিদরা কী এটা জানেন?

আর একটা ব্যাপার খুব অবাক লাগে। দলীয় কর্মীরা (যে কোনও রাজনৈতিক দলের) তাঁদের নেতা-নেত্রীদের বিকৃত আচরণ বিকারগ্রস্ত বুলি মেনে নিচ্ছেন কী করে? তাঁদের তো পেটে কিছুটা বিদ্যে আছে, জ্ঞানগম্যি আছে!

কদর্য ভাষা প্রয়োগের সাম্প্রতিক নমুনা পেশ করা যাক। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে প্রাণ দিলেন জাতীয় নিরাপত্তা গোষ্ঠীর কতিপয় অকুতোভয় সাহসী সদস্য। অর্বাচীন নেতারা তাঁদের এই আত্মবলিদান নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করলেন।

তাই বলছিলাম, প্রজাতন্ত্রের ভাষা নিয়ে সংশয় কাটছে না। স্বাধীনতার ষাট বছর পরেও প্রজাতন্ত্রের ভাষা যদি ইতরস্তরে নেমে আসে এবং সেই ভাষার যদি যত্রতত্র প্রয়োগ হয়, তাহলে বলতেই হয়, এক অজানা আশংকা আর সর্বনাশ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

মিঠু মাইতি, বেহালা।

জনমত

পেট্রো পণ্যের মূল্য কেন কমানো হচ্ছে না?

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়

বর্তমান বাজারে অশোধিত কাঁচা তেলের দাম কমতে কমতে প্রায় ৪০ ডলার প্রতি ব্যারেল এর নীচে নেমে গেছে। এই অবস্থায় পরিশোধিত তেলের দাম অনেকটাই কম হওয়া উচিত। প্রত্যেক উন্নত দেশ চেষ্টা করে পরিশোধিত তেলের দাম কম রাখতে। তেলের উচ্চ মূল্যের প্রভাব প্রত্যেক মানুষের উপর ই পড়ে। যাতায়াতের খরচ বাড়ে। পরিবহন খরচ বাড়ে — এর ফলে প্রত্যেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের দামও বাড়ে। এছাড়া পেট্রোজাত দ্রব্য যেমন Plastic-এর জিনিস, বস্ত্র, উল, কেমিকেল, রং এবং ঔষধ-পত্রের উপরও এর প্রভাব পড়ে। আমাদের দেশে এই পণ্যের দাম সরকার নির্ধারণ করে। কারণ অধিকাংশ পেট্রোপণ্য উৎপন্ন হয় সরকার পরিচালিত রিফাইনারীর মাধ্যমে। যেমন — IOC, Bharat Petro ONGC ইত্যাদি। Private sector এ আছে শুধু Reliance। এদেশে কোনও প্রতিযোগিতা নেই। Govt -এর Monopoly। এর ফলে কাঁচা তেলের দাম উঠা নামার উপর পরিশোধিত তেলের দাম নির্ভর করে না।

এখন দেখা যাক পেট্রোজাত পণ্যের মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশকেই কাঁচা তেল আমদানী করতে হয় — তেল উৎপাদনকারী দেশ থেকে। এই তেল উৎপাদনকারী সংস্থার নাম OPEC। এরাই কাঁচা তেল কত টন উৎপন্ন হবে এবং কী দাম হবে তা ঠিক করেন। এই সংস্থার মধ্যে প্রবল হচ্ছে Middle East অর্থাৎ সৌদি আরব, কুয়েত, ইরাক, ইরাণ ইত্যাদি। এর মধ্যে সৌদি আরবের চাহিদা বেশি। এটার দাম New York থেকে Control হয়। সেইজন্য এটার নাম NVMEX crude বর্তমানে সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে এই কাঁচা তেলের চাহিদা কমে গেছে। যার ফলে তেল উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা কম হওয়ায়, এই তেলের দাম ১৫৪ ডলার ব্যারেল থেকে কমে ৪০ ডলারের নীচে নেমে গেছে।

অভিজ্ঞ অর্থবিদদের মতে, এই মন্দা আরও এক বছর চলবে। আমাদের দেশ এই সুযোগ গ্রহণ করে জিনিস-পত্রের দাম কমাতে পারে।

এই মন্দার প্রভাব আমাদের দেশে কী রকম দেখুন — এক ব্যারেলে তেল মানে ৪৪ আমেরিকান গ্যালন অর্থাৎ প্রায় ১৭০ লিটার। যদি ৪৮ টাকা ডলার ধরি তাহলে, এক লিটার কাঁচা তেলের দাম পড়ে প্রায় ১১টাকা। যে কোনও উন্নত দেশে পরিশোধনের খরচ পড়ে ৬/৭ টাকা প্রতি লিটার। এর উপর লাভ, পরিবহন ও পরিবেশন খরচ এবং ডিলারের লাভ সব ধরে খুচরা বিক্রয় মূল্য প্রায় ৯/১০ টাকা অধিক দিতে হয়। অর্থাৎ Refined তেলের দাম কাঁচা তেলের উপর ৯/১০ টাকা লাগে। তাহলে দেখুন পেট্রল বা Diesel-এর দাম ২০ টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়। আমরা এখন এর দাম প্রায় ৩১ টাকা এবং Diesel এর জন্য প্রায় ১৫ টাকা বেশি দিচ্ছি।

এটার অধিকাংশ Central govt-duty এবং Tax। এ ছাড়া আছে State govt এর Sale Tax। এই Sale Tax 10% থেকে 20% পর্যন্ত লাগানো হয়।

আমি বেশ কিছুদিন আমেরিকাতে ছিলাম। ওখানে Petro পণ্য উৎপাদন পরিবেশন এবং পরিবহন সব কিছুই Refinery -র মাধ্যমেই করে। এবং প্রত্যেক Refinery'র মধ্যে খুবই Competition হয়। এমনকী প্রত্যেক Petrol Pump-এর দাম আলাদা। ওখানে কাঁচা তেলের উপর প্রায় ১০ টাকা খরচ পড়ে। এই ১০টাকার মধ্যে Refiner খরচ, পরিবহন, পরিবেশন, ডিলারের লাভ এবং সমস্ত Tax যুক্ত। খুচরো ক্রেতারা মাত্র ১০ টাকা প্রতি লিটারে বেশি দিয়ে তেল পায়।

আরও মজার কথা হচ্ছে অপরিশোধিত তেল থেকে — হাল্কা তেল (Light distilise) অর্থাৎ ন্যাপথা এবং Petrol প্রায় ১৮/২০ শতাংশ হয়। অধিকাংশ Middle distiliate অর্থাৎ Diesel, Kerosin এবং ATF উৎপন্ন হয়। এই যে হাল্কা তেল এর প্রায় অধিক লাগে Petro Chemical এর জন্য। বাকী অর্ধেক Petrol এ পরিবর্তিত করে বিক্রী হয়। এই Petrol -এর একটা বিরাট অংশ আবার সরকার খরচ করেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, আমলা, পুলিশ, মিলিটারী ইত্যাদি। বাকী সামান্য অংশ জনসাধারণ পায়। এবং তার উপর অত্যাধিক কর চাপানো আছে। এতে সরকারের কতটুকু আয় বাড়ে? অথচ জনসাধারণেরই উপর বোঝা বাড়ে। এইবার আসি রান্নার গ্যাস বা এল পি জি-র কথায়। অপরিশোধিত তেল শোধনকালে এই গ্যাস উৎপন্ন হয়। এটা একটা বাই প্রোডাক্ট। এটাকে কমপ্রেস করে ঠাণ্ডা করলে তরল অবস্থায় আসে। এতে বিশেষ কিছু খরচ পড়ে না। যদি অপরিশোধিত তেলের দাম ১১টা প্রতি লিটার হয় তাহলে এল পি জি-র দামও ১২ টাকা প্রতি লিটার হওয়া উচিত অর্থাৎ প্রায় ২০ টাকা প্রতি কেজি পড়বে। সেখানে আই ও সি-র হিসাব অনুযায়ী একটা সিলিণ্ডার এর দাম পড়ে ৪৫০ টাকা। অর্থাৎ ১০০ টাকা সরকারকে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। এই ভর্তুকির অধিকাংশই কিন্তু Tax। কাজেই শতকরা এক পকেটে নিয়ে অন্য পকেটে থেকে খরচ করছে। বর্তমানে এল পি জি দিয়ে অটো চালানোর কথা হচ্ছে। দিল্লীতে সি এন জি অর্থাৎ কমপ্রেসড নেচর‍্যাল গ্যাস দিয়ে গাড়ি চালানো হচ্ছে। এই সি এন জি-র দাম ১৯ টাকা প্রতি কেজি। তাহলে এখানেও ওই দামে এল পি জি দিতে হবে। একটা সিলিন্ডার এর দাম পড়বে মাত্র ২৭০ টাকা, কোনও ভর্তুকি দিতে হবে না।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে ভারত সরকারের মনোপলি-র জন্য সাধারণ মানুষকে পেট্রোপণ্যের দাম বেশি দিতে হচ্ছে। অন্যান্য উন্নত দেশের মতো আমাদের দেশেও পেট্রোপণ্যের বাজার খুলে দেওয়া হউক। রিফাইনারি-র উপর দায়িত্ব দেওয়া হউক। তারাই পরিহন ও পরিবেশন করুক। প্রত্যেক রিফাইনারি-র মধ্যে কমপিটিশন হউক।

ভারত সরকার ডিউটি বা ট্যাক্স কমিয়ে দিক। রাজ্য সরকারগুলির সেল্‌স ট্যাক্স ইউনিফর্ম হোক বা ভ্যাট (VAT) এর আওতায় আনুন। সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করুক। এইভাবেই দাম কমবে।

স্বামী প্রণবানন্দের দৃষ্টিতে ধর্ম

স্বামী বিক্রমানন্দ

ধর্মকে কেন্দ্র করে সারা দুনিয়ায় কলহ-বিবাদ মাঝে মধ্যে ঘটে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের নজিরও বড় একটা কম নয়। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যায় একদিকে পৃথিবী যখন এগিয়ে চলেছে, তখন ছোঁয়াচে রোগের মতন ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মেতে এক চরম সংকীর্ণতার পঙ্কে নিমজ্জিত হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে ভেদাভেদ। গড়ে উঠছে স্পর্শকাতর মানসিকতা। সন্দেহ নেই, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে এ এক চরম দুঃসংবাদ। আর তার থেকেও বড় দুঃসংবাদ কিছু লেখা-পড়া জানা বিদ্বান মানুষ প্রচারের মাধ্যমকে সচল করে — সাধারণ মানুষদের তাতিয়ে অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতো ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে।

অথচ এমনটা তো হবার কথা নয়। যে ধর্মকে কেন্দ্র করে বিষাক্ত বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে তার তো কোনও দায় নেই। বরং তার কর্তব্য সে ষোলআনা পালন করে চলেছে। দিয়েছে বিশ্ববাসীর সুখ-শান্তির জন্য নিজেকে অক্লেশে বিলিয়ে। কোথাও তো দুঃখের বীজ বোনেনি। তবে কেন সুখের মহীরুহ যন্ত্রণার ফল প্রসব করল?

।। স্বামী প্রণবানন্দের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে প্রকাশিত।।

ধর্মের নিজের কাজ — ধারণ করা। অর্থাৎ যা কিছু জগতে সত্য তা মানবজীবনে প্রতিষ্ঠিত করা। ধর্মের তো কোনও ছোট-বড় নেই, কোনও নীচতা নেই, নেই কোনও শ্রেণী। বিশাল পৃথিবীতে উদার হয়ে উদাসী বাউলের মতো তার পথ চলা। কাল থেকে কালান্তরে — পরিমাপের সীমানা ছাড়িয়ে।

প্রত্যহ এই পৃথিবীর বুকে ঢাক-ঢোল, মৃদঙ্গ আর করতালের সুমিষ্ট আওয়াজে পূজারতি হচ্ছে মন্দিরে মন্দিরে। মসজিদে আল্লার স্তবস্তুতি করে উঠছে আজান, গীর্জায় কাতর আবেদনের প্রার্থনা, প্যাগোডায় ভক্তদের আকুতি। এছাড়া শ্রদ্ধা, ভক্তি আর বিশ্বাসে গড়ে ওঠা আরাধনা কেন্দ্রে জড়ো হয়ে ঈশ্বরের কোনও আবেদনের বার্তা পাঠানোর কত আয়োজন। কিন্তু বাস্তবে এসে কোথায় যেন সব খেই হারিয়ে যাচ্ছে। আবেদন-নিবেদন বা প্রার্থনার প্রতিশ্রুতি নিমেষে মরণের কোলে ঢলে পড়ছে। পরিবর্তে গড়ে উঠছে অপ্রত্যাশিত ক্রিয়াকর্ম। সকলে কোথায় আপন করে সকলকে টেনে নেবে, প্রেমের স্পর্শে জড়িয়ে ধরবে, পবিত্র হয়ে জগতে শান্তি বিলোবে তা নয়, কোথা থেকে আসছে গা ছমছম জীবন যন্ত্রণা, বুক হিম করা অপ্রত্যাশিত ভয়। তাহলে কি বলতে হবে ধর্মের অপব্যবহার চলছে। না কিছু খ্যাপা ধর্মকে উল্টো হাওয়ায় ঠেলে দিয়ে মজা লুটছে। সত্যিই যদি তাই হয়, তাহলে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের কাছে সে এক দুঃস্বপ্নের কাহিনী।

ধর্মকে আশ্রয় করে বিশ্বে যখন চাপা উত্তেজনা, খণ্ড-বিখণ্ড করার হীন ষড়যন্ত্র, সন্দেহ নেই তখন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা 'স্বামী প্রণবানন্দের' কথা জনমানসে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করবে। 'ধর্ম নেই মালায় ঝোলায়, ধর্ম নেই মন্দির মসজিদ গির্জায়। ধর্মের প্রাণ আচার অনুভূতি আর অনুষ্ঠানে।' এই উক্তির ভেতর থেকে আমাদের খুঁজে নিতে হবে প্রকৃত ধর্মের সূত্রকে। উদ্ধার করতে হবে ধর্মের গূঢ় রহস্যকে এবং তা প্রতিফলিত করতে হবে বাস্তব জীবনে।

দুষ্টিনন্দন মন্দির, মসজিদ, গির্জা বা প্যাগোডা বানিয়ে গতানুগতিক নিয়ম রক্ষার জন্য দলে দলে গিয়ে জড়ো হলেই প্রকৃত ধর্মের রহস্য উদ্ধার করা যায় না।

যে যেখানে থাকুক না কেন, নিষ্ঠার সঙ্গে সত্যকে আঁকড়ে থাকলে তার ওপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ সর্বদা প্রতিফলিত হতে বাধ্য। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন — 'তাঁর দয়ায় বাতাস অবিরত বইছে, তোর ভাবের পাল তুলে দে, উজানে ভেসে যাবি।' উজান বলতে অনাবিল আনন্দে ডুবে থাকার ইঙ্গিত করেছেন তিনি।

মানুষে মানুষে প্রেম, ভালবাসা, পরের দুঃখে নিজের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, সুখের ভাগ সবাই মিলে উপভোগ করা — এটাই তো ধর্ম। তার জন্য গতানুগতিক চোখ ধাঁধানো আরাধনা স্থলের তেমন প্রয়োজন আছে কি? সে তো আচার ব্যবহার আর নিজস্ব অনুভূতির ব্যাপার। যে সকলকে সেবা করতে পারে সেই প্রকৃত ধার্মিক। সেই আসল নেতা। তাই 'সকলকে সকল প্রকার সেবায় নিপুণ হতে হবে।' স্বামী প্রণবানন্দ আজীবন এই নীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে গেছেন। তাঁর অনুগামীদের সে কথাই বারবার শুনিয়েছেন। কর্ম থেকে কর্মান্তরে যাওয়ার নাম বিশ্রাম। দিনটা যদি আরও বড় হতো, তাহলে অনেক বেশি কাজ করা যেত। তাই তিনি জগৎ-মঙ্গল কর্মে নিয়ত নিরত হয়ে থাকতেন। আত্মসুখের জন্য এতটুকুও লালায়িত ছিলেন না। শরীর তো হাড়মাংসের খাঁচা বই নয়। একদিন তার অবলুপ্তি ঘটবেই। তখন চিতাশয্যায় দুই মুষ্টি ভস্ম ভিন্ন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

দার্শনিক প্লেটোর ভাষায় মানুষের সকল কর্মের উৎস প্রধানতঃ তিনটি — আকাঙ্ক্ষার আকুলি-বিকুলির জন্য তাঁর

(এরপর ১৫ পাতায়)

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান

পৃথিবী সম্পর্কে প্রাচীন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ধারণা

কমল ব্যানার্জী

পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে মহাকাশের দিকে তাকালে সূর্য, চন্দ্রের সঙ্গে আমরা নানা গ্রহ, নক্ষত্র দেখতে পাই। মহাকাশে পৃথিবীকে দেখতে কেমন লাগে তা কিন্তু

দেখা সম্ভব নয়। মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানোর পর সেটা সম্ভব হলেও প্রাচীনকালে মানুষ অনুমানের ওপর নির্ভর করেই পৃথিবীর কল্পনা করতেন। তাই প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পৃথিবী সম্পর্কে জানার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও পিছিয়ে ছিলেন না। পৃথিবীর আকার আয়তন আবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁদের নানাবিধ চিন্তাভাবনা প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে এসব সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কোপারনিকাসের পূর্বে ইউরোপে ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা ছিল পৃথিবী কেন্দ্রিকা অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সকলেই পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। কোপারনিকাসই প্রথম সূর্য কেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলেন। এর অনেক আগে খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতীয় গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট্ট (কুসুমপুর) এই মত ব্যক্ত করেছিলেন। পৃথিবী সূর্যকে পরিক্রমণরত। নিজের অক্ষদণ্ডকে কেন্দ্র করে আবর্তন করে। তাই দিবারাত্রি হয়। এমন সব সিদ্ধান্ত আর্যভট্টীয় গ্রন্থের দশগীতিকা অধ্যায়ে উল্লেখ আছে। কোপারনিকাসের মত সমর্থন করার জন্য জিওর্দানো ব্রুনোকে আগুনে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। গ্যালিলিওকে নির্যাতিত হতে হয়েছিল। বহু শতাব্দী আগে, আর্যভট্ট যখন একই মত পোষণ করেছিলেন, তখন তাঁকে কোনও হেনস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি। এই ঘটনা প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-দীক্ষায় উদার মনের পরিচয় বহন করে। আর্যভট্ট তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন —

"অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগংযদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চি মগানি লঙ্কায়াম্।"

শ্লোকটির বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায়, পূর্ব দিকে যে নৌকা ভেসে চলেছে তাতে উপবিষ্ট ব্যক্তি নদীর তীরবর্তী অচল সবকিছু পশ্চিমদিকে ধাবমান হতে দেখবে, তেমনই অচল-নক্ষত্র সমূহকে লঙ্কা থেকে পশ্চিম দিকে ধাবমান হতে দেখা যায়। আর্যভট্টের এই অভিমতই প্রমাণ করে যে তিনি জানতেন, পৃথিবী পূর্ব দিকে আবর্তন রত। এই শ্লোকটিতে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় আছে। তিনি তাঁর বক্তব্যকে লঙ্কাদেশের (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা) পটভূমিতে ব্যক্ত করেছেন। কেন এমন করলেন? ভারতবর্ষের কোনও অঞ্চল বেছে না নিয়ে 'লঙ্কা'কে বেছে নিলেন কেন? চোখ ফেরানো যাক ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থানের দিকে। পৃথিবীর মাঝ বরাবর রয়েছে বিষুবরেখা। ভারতবর্ষের মূল ভূ-খন্ড এই রেখার অনেকটাই উত্তরে অবস্থিত। সে তুলনায় উত্তরে হলেও লঙ্কা এই রেখার অনেকটাই কাছাকাছি অবস্থান করছে। তাই বলা যেতে পারে লঙ্কা পৃথিবীর প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত। সম্ভবত এই কারণেই আর্যভট্ট তাঁর এই জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বক্তব্যকে লঙ্কাদেশের পটভূমিতে বিচার করেছেন।

আর্যভট্টের এই মতবাদ সে যুগের অন্যান্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মেনে নেননি। এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে যার নাম করতে হয় তিনি হলেন জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির। ইনি আর্যভট্টের প্রায় সমসাময়িক। তিনি তাঁর পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, পৃথিবী ঘূর্ণায়মান এবং আবর্তনরত হলে উড্ডীয়মান পক্ষীকুল তাদের বাসায় ফেরে কীভাবে?

আর্যভট্টের পরবর্তীকালে যে সকল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কথা আমরা জানতে পেরেছি তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লল্ল ও ব্রহ্মগুপ্ত। এঁরাও ভূ-ঘূর্ণায়মান মতবাদ গ্রহণ করেননি। পরবর্তীকালে আরও অনেক ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট্টের মতবাদকে মেনে নিতে পারেননি। এর মূল কারণ সে যুগে আপেক্ষিক গতিবেগ সম্পর্কে অজ্ঞাত। তবে সকলেই যে বিরোধিতা করেছিলেন তা নয়। ব্রহ্মগুপ্তের বিখ্যাত টীকাকার পৃথকদস্বামিন্ আর্যভট্টকে সমর্থন করে

(এরপর ১৫ পাতায়)

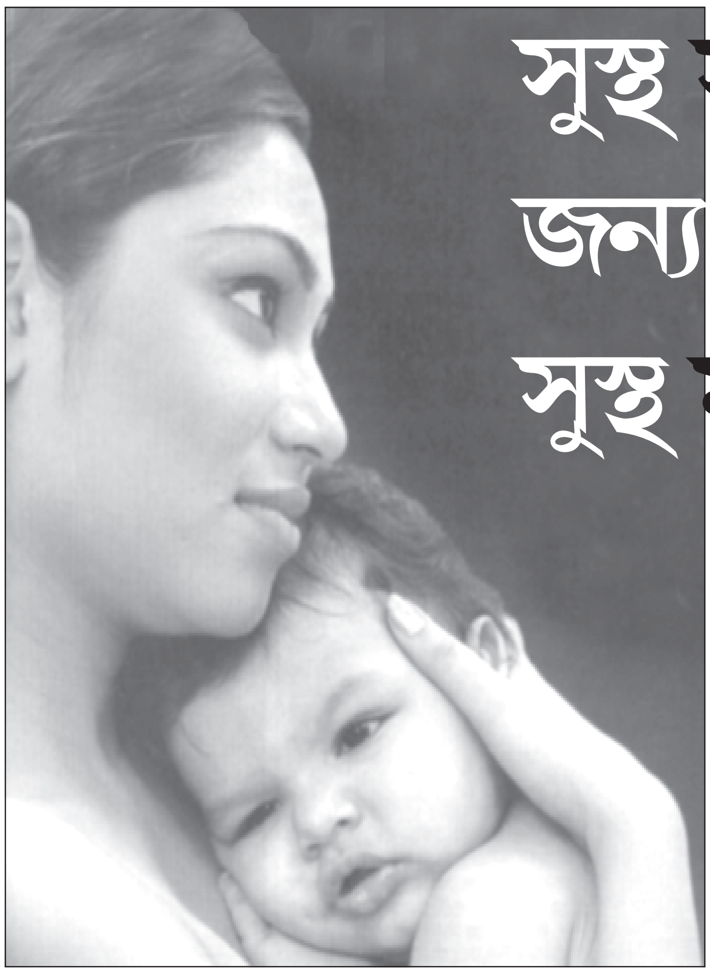

সুস্থ সন্তানের জন্য চাই সুস্থ মাতৃত্ব

ইন্দিরা রায়।। সমাজে মাতৃজাতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মা তার সন্তানকে জন্ম দিয়ে তাকে লালন-পালন করে শিক্ষা-দীক্ষায় একজন শিক্ষিত আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। সুতরাং মায়েদের প্রতি যত্ন এবং সতর্ক নজর রাখা দরকার। কিন্তু সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, সদ্য সন্তান প্রসবা মহিলাদের মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি, বিশেষত আমাদের দেশে। সে ব্যাপারে গত ৬০ বছরে কোনও রকম পরিবর্তন ঘটেনি। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এই ঘটনার মূলে প্রকৃত কারণ কি। দেখা গেছে, শ্রীলঙ্কায় এই ধরনের মৃত্যুর হার মাত্র কুড়ি শতাংশ। যদি তারা এ কাজ পারে, তাহলে আমরাই বা পারব না কেন!

এই তো সেদিন জানতে পারলাম যে, আমাদের পাশের কলোনির চবিবশ বছরের রুমা তৃতীয় সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছে। হবেই তো। পেটে খাবার নেই। দুটি কন্যা সন্তানকে সুখাদ্য খাওয়ানো তো দূরের কথা, দু'বেলা দু'মুঠো ভাত দিতে পারত না। চোখে দেখা ছোট্ট সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী রুমার নতুন বউ হয়ে আসা। মাত্র চবিবশ বছরে শরীরের সব রস রঙ নিঙড়ে শুকিয়ে শেষ হয়ে গেল। এরকম কত রুমার কথাই আমরা জানতে পারি অহরহ। কিন্তু কেন এই মর্মান্তিক ঘটনা, কি কারণ নিহিত আছে এর পেছনে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, সন্তান প্রসবাদের মৃত্যুর এই হারের মূলে একটাই কারণ — রক্তাল্পতা। 'হু' (ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ্‌ অর্গানাইজেশন) ১৯৯২-তে সার্ভে করে দেখেছে যে, ভারত সরকারের কাছে অ্যাবরশন বা গর্ভপাতের কোনও সংখ্যাতত্ত্বই নেই। ২০০২-তে দেখা গেছে, ভারত এ ব্যাপারে শীর্ষে। ১৮ থেকে ২০ লক্ষ অ্যাবরশন প্রতি বছর হয়ে থাকে। কিন্তু সরকারি হিসেবে দেখানো হয়েছে ৫ থেকে ৮ লক্ষ অ্যাবরশনের ঘটনা ঘটেছে গত পনেরো বছরে। পিল সেবন করার মধ্য দিয়েই 'গর্ভপাত' ঘটানো অন্যতম পথ অবলম্বন করা হয়।

এক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, আমরা কেন সচেষ্ট হই না? প্রসবকালীন অবস্থায় রোগীদের রক্তাল্পতা থেকে বাঁচাতে। এক্ষেত্রে গর্ভধারিণী মায়েদের অ্যানিমিয়া থেকে রক্ষা করতে তিনটি বিষয়ের ওপর দৃষ্টি দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। প্রথমত, অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণ বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, গর্ভাবস্থায় রক্তহীন মায়েদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে, প্রয়োজনে হাসপাতাল বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করাতে হবে। তৃতীয়ত, বাড়িতে কখনই প্রসব করানো উচিত নয়। যে কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা চিকিৎসাকেন্দ্রে অবশ্যই গর্ভপাত করানো উচিত। শুধুমাত্র তাই নয়, অভিজ্ঞ নার্সদের দ্বারা করাতে হবে, আয়া বা ধাত্রীমাদের দ্বারা নয়। বৃটেন এবং মধ্য-পূর্ব দেশগুলিতে প্রায় আশি শতাংশ ডেলিভারির ব্যাপার নার্সরাই দক্ষতার সঙ্গে করে থাকেন।

আমাদের দেশে প্রায় পঁচাত্তর ভাগ গর্ভধারণ হয় মায়েদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। মায়েরা না চাইলেও বাধ্য হয়, অন্য কোনও রাস্তা বা উপায় থাকে না বলে। কিছু মহিলা আছেন, যারা হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে গর্ভপাত করিয়ে আসেন। তবে এর ফল খুবই সাংঘাতিক, এটা তারা বোঝেন না। পরবর্তী সময়ে তাঁরা শারীরিকভাবে ভীষণ অসুস্থ বা মৃতপ্রায় হয়ে পড়েন।

দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের দেশে গর্ভপাতের নির্দিষ্ট কোনও পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। অথচ, সাধারণভাবে দেখা গেছে আঠারো থেকে কুড়ি লক্ষেরও বেশি গর্ভপাত প্রতি বছরে হয়। যে হারে গর্ভপাত ঘটে তার পেছনে যেসব গর্ভনিরোধক ব্যবহৃত হয়, তা যথেষ্ট নিরাপদ নয়। গর্ভনিরোধক হিসেবে সবচেয়ে ভাল পিল আর আই ইউ সি ডি। গর্ভধারণকে পাঁচ শতাংশ নামিয়ে আনা যায় এই গর্ভ-নিরোধকের ব্যবহারের ফলে। সবচেয়ে উচ্চগুণমানের ওষুধ আই ইউ সি ডি; যেমন — সি ইউ টি-৩৮০। এখন ভারতে সহজেই পাওয়া যায় পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলিতে। কিন্তু এখানকার কর্মীরা দু'শতাংশ ওষুধ বিতরণ করেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু এর পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশ চীনে প্রায় চল্লিশ শতাংশ মহিলা এই উচ্চগুণমানের ওষুধ ব্যবহারের সুযোগ পান। ভারত সরকারের মেডিকেল এবং নার্সিং বিভাগের এই ওষুধ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় কারণ হল, সন্তান-সম্ভবাদের ক্ষেত্রে বেশি মাত্রায় এম এম আর প্রয়োগ খুবই নিম্নমানের। তবে ইদানিং দেখা যায় গর্ভবতী হওয়ার পর পরই প্রায় ৫০ শতাংশ মহিলা ডাক্তারের কাছে আসেন। এখানে তাদের ব্লাডপ্রেসার, রক্ত পরীক্ষা, ইউরিন পরীক্ষা করা হয়। এটাও লক্ষণীয়, প্রায় পঞ্চাশ থেকে সত্তর শতাংশ গর্ভবতীদের ব্লাডগ্রুপ পরীক্ষা করা হয় না। তাদের এইচ আই ভি এবং ভি ডি আর এল - এর জন্য সরিয়ে রাখা হয়। মাত্র কুড়ি শতাংশ আয়রন ফলিক অ্যাসিড-এর ট্যাবলেট পায়। বাকিরা নিতে অনিচ্ছুক হয় বা অনেক সময় পায়ও না। এর পেছনে কিছু কারণ আছে। প্রথমত, তারা সরকার অর্থাৎ প্রশাসনের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এদের একথা বুঝিয়ে বলা হয় না যে, শরীরে রক্তাল্পতা আগামী শিশুর ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে। এমনকী তাদের অর্থাৎ সন্তানদের আই কিউ পাঁচ থেকে পনেরো পয়েন্টে নেমে যায়।

অঙ্গনা

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে গর্ভবতী অবস্থায় মায়েদের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ রক্তাল্পতা বা রক্তশূন্যতা।

সেই কারণেই সন্তানসম্ভবা মহিলাদের বিশেষ কতগুলি জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, যার ফলে তাঁরা কিছু উপকার পেতে পারেন। গর্ভবতী অবস্থায় রক্তাল্পতা, আই ইউ জি আর অতিরিক্ত পরিশ্রম হলে প্রাথমিক অবস্থাতেই ডাক্তার দেখিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। রক্তহীনতা দূর করার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে তা অবিলম্বে কিছুটা স্বাভাবিক স্তরে আনা যায়। এর ফলে প্রসবকালীন মৃত্যুকে এড়ানো যায়। প্রসবকালীন অবস্থায় কোনও রকম সংক্রমণ বা দূষণ ঘটা থেকেও রেহাই পাওয়া যায়। গর্ভাবস্থায় মহিলাদের নিয়মিত ডাক্তার দেখানো, রক্ত পরীক্ষা, গর্ভাবস্থায় নির্ধারিত খাদ্য গ্রহণ, ফোটানো জল পান, বিকেলের বিশ্রাম প্রয়োজন। এসব হওয়া এবং নবজাতককে স্তন্যদুগ্ধ পান করানো খুবই জরুরি অন্তত দু'বছর পর্যন্ত। গর্ভপাত একান্ত করাতে হলে, দশ সপ্তাহের মধ্যে করাতে হবে — এই নির্দেশ দেন চিকিৎসকেরা।

এসবের পর বাচ্চার ওজন ৩ কেজি হওয়া যেমন ঠিক নয়, আবার কম ওজনের সন্তান হওয়া সঠিক নয়, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এ ব্যাপারে এবং সেইসঙ্গে ভ্রূণঘটিত অস্বাভাবিক গঠনও আটকানো যেতে পারে। সদ্যোজাত বাচ্চার অ্যাসবিক্সিয়া অসুখও রোধ করা যেতে পারে, এসব অবস্থায় মৃত্যুর হারও কমানো যায়। চেন্নাই-এর এক রিপোর্টে দেখা গেছে একটা বিষয় যা পরিষ্কার ভাবে জানাচ্ছে, এখানে আয়রন ট্যাবলেট গর্ভবতীদের দেওয়ার ফলে দেখা গেছে, রক্তহীনতা অনেকাংশে দূর হয়েছে, এমনকী বিয়ের আগেও মহিলারা রক্তাল্পতা থেকে অনেকাংশে মুক্ত।

কিন্তু এর পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে ভারতের বেশিরভাগ রাজ্যেই বিশেষত গ্রামাঞ্চলে এবং বস্তি এলাকায় গর্ভবতী মহিলাদের অবস্থা অসন্তোষজনক ও হতাশাপূর্ণ। যে সব ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায়

(এরপর ১৫ পাতায়)

ত্রিপুরার সন্ত

শ্রীমৎ স্বামী দয়ালানন্দ

ডঃ জগদীশ গণ-চৌধুরী

শ্রীমৎ স্বামী দয়ালানন্দ পূর্ব বঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত জামালপুর গ্রামে ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১ ফাল্গুন (১৮৯৯ ইং) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব নাম শিবচরণ ভৌমিক। তাঁর পিতার নাম রাজচন্দ্র ভৌমিক, মাতার নিত্যময়ী দেবী।

শৈশবে শিবচরণ দীর্ঘদিন জ্বরে ভোগেন এবং পাঁচ বৎসর বয়সে মাতৃহারা হন। পিতা দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। বালক শিবচরণ খেলা-ধূলা করে সময় কাটাতেন; মাত্র তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন।

পিতার উপদেশে প্রায় প্রতিদিন গীতা পাঠ করতেন। এছাড়া, গান-বাজনা ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। কবিগান, যাত্রাগান, পালাগান, ভজন-কীর্তন যেখানে হতো, সেখানে যেতেন। এমননই এক আসরে, প্রশ্নোত্তরে জনৈক কবি বললেন যে, কয়লার ময়লা জ্বলন্ত অগ্নিতে দিলে ঘুচে যায়। এ কথাটি তাঁর অন্তরে তড়িৎ প্রবাহের মতো কাজ করে। ষড়রিপুজনিত কালিমা ঘুচানোর জন্য সৎগুরুর আশ্রয়ে সাধন-ভজন অত্যাবশ্যক বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল। তিনি অধীর আগ্রহে গুরুর সন্ধান করতে থাকেন। অচিরেই গুরু পেয়ে গেলেন।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম শিষ্য বিবেকানন্দের আরেক শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার। বিবেকানন্দের সমসাময়িক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথের শিষ্য হলেন স্বামী দেবোনোন্দ। দেবোনোন্দের শিষ্য হলেন শিবচরণ, অর্থাৎ দয়ালানন্দ। দেবোনোন্দ থাকতেন আখাউড়াতে। তিতাস নদীর পশ্চিম পাড়ে, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সাধনা কুটির নামক আশ্রমে। দীক্ষা লাভ করার পর শিবচরণের অন্তরে বিষয়-বৈরাগ্য, গুরুর চরণে আত্মসমর্পণের ঐকান্তিক আগ্রহ তীব্রতর হয়। তিনি পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে অনুমতি চাইলেন — সংসার ত্যাগ করার। সদস্যরা অনুমতি দিল না, বরং সকলেই সংসারত্যাগী হয়ে শিবচরণের অনুগামী হতে চাইল। অনেক জল্পনা-কল্পনার পর, অবশেষে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে পূর্ণিমার রাত্রে গোটা পরিবার রওনা হল গুরুর আশ্রম অভিমুখে।

১৩৩৬ বাংলার ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে ময়মনসিংহ ছেড়ে চলে এলেন আখাউড়াতে- গুরুধামে। পরে বাংলা ১৩৪৩, ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে ধলেশ্বরে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

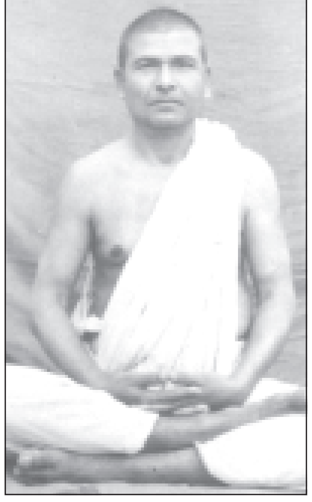

স্বামী দয়ালানন্দ

সাধনা কুটির নামক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌কালের ঘটনা।

সপ্তবর্ষব্যাপী (১৯৩০-১৯৩৬ ইং) গৃহহারা হয়ে থাকার পর, আবার আশ্রমিক গৃহ পেয়ে (১৯৩৭ ইং) পরবর্তী ২৫ বৎসর (১৯৩৮-১৯৬২ ইং) বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করেছেন এই সন্ত পরিবার। এই পঁচিশ বৎসর হল রামকৃষ্ণ সাধনা কুটিরের সুবর্ণ যুগ, বা দিগ্বিজয়ের যুগ। আগে শুধু একটি পরিবারের ১৭ জন লোক নিয়ে আশ্রম ছিল। সুবর্ণযুগে ভিন্ন বর্ণ ও বংশ থেকে এলেন স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী জ্ঞানানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ। দান- দক্ষিণা সংগ্রহের জন্য তাঁরা অনেকেই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন। পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ , অসম ও ত্রিপুরায় প্রতি বছর আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ — এই পাঁচ মাস দান সংগ্রহে যেতেন স্বামীজীরা। দান সংগ্রহকারীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন স্বামী দয়ালানন্দ, দীনানন্দ, দ্বারকানন্দ, দ্বিজানন্দ, দর্শনানন্দ, দীনেশানন্দ, অভেদানন্দ, প্রেমানন্দ, জ্ঞানানন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। স্বামী দয়ালানন্দের বিষয়বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ। ভিক্ষালব্ধ অর্থের যোগক্ষেম করতে, গঠনমূলক কাজে লাগাতে, মূলধনী আয় বাড়াতে তিনি দক্ষ ছিলেন। আগরতলার পূর্ব দিকে, কয়েক ক্রোশ দূরে, ইচামুয়া এবং রাধাকিশোর নগর নামক গ্রামে কৃষিভূমি কিনে দুইটি খামার গড়ে তোলা হল। এই ভাবে স্থায়ী ও নিশ্চিত উপার্জনের ব্যবস্থা করে, আশ্রমের ঘর ও মন্দির পাকা করা হল, অতিথিশালা, ছাত্রাবাস, দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, সংস্কৃত টোল গড়ে তোলা হল। ভজন, কীর্তন, গান-বাজনা, পূজা-পার্বণে এই আশ্রম ছিল আগরতলার মধ্যে সেরা প্রতিষ্ঠান। এই আশ্রমের দুর্গাপূজার বিশেষত্ব ছিল জীবন্ত মানুষকে দুর্গা, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী সাজিয়ে পূজা করা। অতঃপর অধঃপতনের পালা শুরু। কিছু লোক স্বামী দয়ালানন্দের বিরুদ্ধে নানা রকম অপবাদ রটাতে থাকল। অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ আনল। ইংরেজির ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত চলল বাদানুবাদ। বিচারালয়ে সেই অভিযোগ নাকচ হল। কিন্তু এতে স্বামীজী মনে আঘাত পেলেন। তিনি এবার অন্যভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। রাধাকিশোর নগরস্থ খামার বিক্রয় করে, সেই টাকা নিয়ে জলপাইগুড়ি চলে গেলেন ১৯৬৭ সালে। সেখানে ৭০ কানি ভূমি কিনে গড়ে তুললেন শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সাধনালয়। এই আশ্রমেই তিনি ১৩৭৬ বাংলার ১ ফাল্গুন (১৯৭০ ইং) দেহত্যাগ করেন।

খড়্গাপুরে কলকাতা আই টি মিলনের শিবির

সঞ্জিত কুমার ।। গত ১০ থেকে ১২ জানুয়ারি খড়্গাপুর আই আই টি-র কাছে গোপালী আশ্রমে বিবেকানন্দ যুব বিকাশবর্গ হিসাবে তিন দিনের একটি শিবিরের আয়োজন করেছিল আই আই টি-মিলন কলকাতা। বিভিন্ন ক্ষেত্রের ৩৭ জন পেশাগত (Professionals) মানুষ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শ ও কার্যপদ্ধতি জানতে এই শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন। বিখ্যাত কয়েকটি আই টি কোম্পানীতে কর্মরত ব্যক্তি, আই আই টি ছাত্র, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, ডাক্তার এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। কীভাবে মিলন ও শাখার কাজ পরিচালনা করতে হয়, কীভাবে আরও যুবককে এই কাজে আকর্ষিত করতে হয়

মঞ্চে (বাঁ দিক থেকে) রাম মাধব, ঠাকুরদাস অধিকারী ও সজ্জনজী।

ইত্যাদি ছিল এই শিবিরের প্রশিক্ষণের বিষয়। সেবা ও সম্পর্ক কীভাবে করতে হয় তাও ছিল প্রশিক্ষণের বিষয়। শিবিরে যোগদানকারী সফটওয়্যার কনসালটেন্ট মনীষের মতে, এই শিবির হল তাদের সকলের কাছে দৈবিক অভিজ্ঞতা। সঙ্ঘের সাংগঠনিক কার্যাবলী, আদর্শ ও ব্যবহারিক কর্মকুশলতা জানার এক বিরাট সুযোগ।

সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী মন্ডলের সদস্য রামমাধবজী শিক্ষার্থীদের পথপ্রদর্শন করেন। তিনি যুবকদের এগিয়ে এসে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। প্রশ্নোত্তরের এক কার্যক্রমে সজ্জন কুমার জানান, কীভাবে ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডসহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে জনজাতিদের সরলতা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ধর্মান্তরকরণের কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

জনজাতিদের মধ্যে চেতনা জাগরণের জন্য তিনি সকলকে সক্রিয় হওয়ার কথা বলেন।

পরলোকে সঙ্ঘের মেদিনীপুর বিভাগ কার্যবাহ স্বপন কুমার ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অকালে অসময়ে হঠাৎ করে চলে গেলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মেদিনীপুর বিভাগ কার্যবাহ স্বপন কুমার ঘোষ। গত ১ ফেব্রুয়ারি রাত্রি ১২-৫৫ মিনিটে কলকাতায় তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৬ বছর। রেখে গেলেন — স্ত্রী, মা, কন্যা, জামাতা, নাতনী ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব ও স্বয়ংসেবকদেরকে। বাংলা ১৩৬০ সনের ১২ই ভাদ্র মেদিনীপুর জেলার কেশপুরের নিকটবর্তী এক গ্রামে তাঁর জন্ম।

সিংহহৃদয়, পরোপকারী, যথার্থ নিষ্কাম কর্মযোগী ছিলেন সবার প্রিয় স্বপনদা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মেদিনীপুর কলেজে হিসাব বিভাগে চাকুরি করতেন। মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ প্রবীর কুমার চক্রবর্তী নিজে স্বপনদার শরৎপল্লীস্থিত বাড়িতে এসে শোকস্তব্ধ সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন। মেদিনীপুর কলেজের পক্ষ থেকে শোকবার্তায় অধ্যক্ষ মহোদয় স্বপনদাকে কর্তব্যনিষ্ঠ, সৎ, পরিশ্রমী ও উদারহৃদয় বলে উল্লেখ করেছেন।

সঙ্ঘমহলে তাঁর মৃত্যুসংবাদ সকলের কাছেই আকস্মিক ও শোকাবহ। কলকাতা থেকে শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত, প্রান্ত প্রচারক প্রমুখ প্রদীপ দে এবং কলকাতার সহ-সেবা প্রমুখ রঞ্জনকান্তি ভুঁএঞা।

অজাতশত্রু, মিষ্টভাষী, কঠোর পরিশ্রমী স্বপন কুমার ঘোষ ছিলেন পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান।

তাঁর অকাল প্রয়াণ শুধুমাত্র সঙ্ঘ নয়, সবার কাছেই এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর অমর আত্মা শান্তি লাভ করুক ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা।

চেন্নাই-এ প্রথম আধ্যাত্মিক ও সেবা মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বইমেলা, শিল্পমেলার মতো এবার চেন্নাই-তে তিনদিন ধরে অনুষ্ঠিত হল হিন্দু আধ্যাত্মিক ও সেবা মেলা। গ্লোবাল ফাউন্ডেশন ফর সিভিলাইজেশনাল হারমোনি-র চেন্নাই শাখা এই মেলার উদ্যোক্তা। এ ধরনের মেলা এই প্রথম। দেশের ৩৩টি হিন্দু সংগঠন এই মেলা সফল করতে সচেষ্ট ছিল। চেন্নাই-এর জয়গোপাল গারোডিয়া বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে আয়োজিত এক বিশাল জনসমাবেশে গত ৬ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেন হিন্দু ধর্মাচার্য সভার প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।

এই মেলার সংগঠন সম্পাদক স্বামী মিত্রানন্দ বলেন, আগামী দিনে আরও বড় আকারে এই মেলা দিল্লীর প্রগতি ময়দানে কিংবা চেন্নাই-এর জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে করার পরিকল্পনা রয়েছে। সাধারণ মানুষ, বিশেষত ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি এবং বিভিন্ন সেবাকাজ-এর মঞ্চ হিসাবে তুলে ধরাই এই মেলার লক্ষ্য।

সভাপতির ভাষণে রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী অভিরামানন্দ বলেন, ধর্ম হচ্ছে অনুভূতির বিষয়, কোনও মতবাদ নয়। নিত্যানন্দ ধ্যানপীঠম্-এর স্বামী নিত্যানন্দ পরমহংস বলেন, হিন্দুধর্ম সকলকেই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা দিয়েছে।

দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ

গত ৩১ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভবানীপুর ‘‘নাগরিক সুরক্ষা ফোরাম’’-এর উদ্যোগে অম্বুজ দেবনাথ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্থানীয় দুস্থ গ্রামবাসীদের ২৫০টি ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা হয়।

শিক্ষা বিস্তারে দান

মালদহ শহরের আবাল্য প্রবীণ স্বয়ংসেবক অধুনা কল্যাণী নিবাসী হিতেন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়ের সহধর্মিনী শ্রীমতি শেফালী ঘোষ তাঁর কল্যাণীর বাসভবনটি, (বি-১২/৯৫ -কল্যাণী) ‘সরস্বতী শিশু মন্দির’ প্রতিষ্ঠা কল্পে বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গকে গত ৬ আগস্ট ২০০৮ সনে দানপত্র করিয়া দিয়াছেন। বিদ্যালয়টি তার পূজ্যপাদ মাতা ঠাকুরানী ‘অমিয় প্রভা গুহ বিশ্বাস’ মহাশয়ার নামে হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ ২০০৯ সন থেকেই ‘অঙ্কুর’ বিভাগ দিয়ে পঠন-পাঠন শুরু হচ্ছে।

অর্শ চিকিৎসা শিবির

গত ১৪ ডিসেম্বর, সমাজ সেবা ভারতীর উদ্যোগে আসানসোলের নিয়ামতপুরে একটি অর্শ চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শিবিরে অর্শ চিকিৎসক ডাঃ বি সি, সাহা ইঞ্জেক্সন পদ্ধতিতে মোট ৭৫ জন রুগীর চিকিৎসা করেন। সঙ্ঘ ও সঙ্ঘ পরিবারের বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তাগণ কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা করেন।

সংস্কার ভারতী, উত্তরপাড়া শাখার ভারতমাতা পূজা

গত ২৬ জানুয়ারি স্থানীয় অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠের সাংস্কৃতিক কক্ষে ‘‘ভারমাতা পূজন দিবস’’ পালিত হল। প্রবীণ সঙ্গীতসাধক অচিন চক্রবর্তীর পরিচালনায় সংস্কার ভারতীর সদস্য-সদস্যরা দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। কবি নীহার রঞ্জন বসু কয়েকটি স্বরচিত চতুর্দশপদী কবিতা আবৃত্তি করেন। সুবীর মল্লিক, সমাপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌসুমী তেওয়ারি, ইন্দুভূষণ রায়, বালক শিল্পীদ্বয় ভিশান ও নিহাল মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। আবৃত্তিতে ছিলেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী, সরস্বতী চৌধুরী ও প্রবীর কুণ্ডু। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সৌমেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবেকানন্দ পাঠদান কেন্দ্রের বাৎসরিক অনুষ্ঠান

তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ১৪৭ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে গত ১২ জানুয়ারি বসিরহাট রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যালয় ‘গীতা-ভবনে’ অনুষ্ঠিত হল বিবেকানন্দ পাঠদান কেন্দ্রের বার্ষিক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, মুম্বাই-এর শহীদ সৈনিকদের উদ্দেশ্যে নীরবতা পালন, শান্তিমন্ত্র পাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন দেবীপ্রসাদ নন্দ (প্রাক্তন অধ্যাপক), সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন মোহনলাল যাদব (প্রাক্তন বি এস এফ কমান্ডার), প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীনিবাস দাস (শিক্ষক, বসিরহাট টাউন হাইস্কুল)।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী পান্নালাল নাথ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ প্রচারক বুদ্ধ দেব মন্ডল।

বসিরহাট জেলা সেবা প্রমুখ সুখেন্দু মন্ডলের উদ্যোগে সামগ্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়। আবৃত্তি, গল্প, যোগাসন, গোপুরম্ নৃত্য, সংগীত ইত্যাদিতে পাঠদান কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানটিতে দর্শকদের ভীড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ‘ম্যাজিক’। সর্বশেষে মঞ্চ স্থ হয় শিশু মনের উপযোগী বোধমূলক নাটক ‘সত্যের সন্ধানে’।

মঙ্গলনিধি

সঙ্ঘের নবদ্বীপ শাখার বৌদ্ধিক প্রমুখ ডঃ অরুণ কুমার চক্রবর্তী তাঁর পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে পুত্রবধূ কণা চক্রবর্তীর হাত দিয়ে এক হাজার একশত টাকার মঙ্গলনিধি প্রদান করেন। প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে প্রবীণ সমাজসেবী বৃন্দাবনধর গোস্বামী এই মঙ্গলনিধি গ্রহণ করেন।

বার্ষিক হোমিও চিকিৎসক সম্মেলন

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের উদ্যোগে আগামী ২২ মার্চ সকাল সাড়ে আটটা থেকে বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে হোমিও চিকিৎসক, ছাত্র ও অনুরাগীদের বার্ষিক সম্মেলন। সম্মেলনের স্থান ৯-এ অভেদানন্দ রোড, কেশব ভবন, কলকাতা-৬। প্রতিনিধি শুল্ক-১২৫ টাকা, যোগাযোগ- ডাঃ জে কুন্ডু - ৯৪৩৩৮২০১৮৫/৯৮৩১৪৯১৬৫৮।

মাতৃ সম্মেলন

গত ২৯ জানুয়ারি হুগলী জেলার বলাগড় প্রখন্ডে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পরিচালনায় সারাদিন ব্যাপী মাতৃ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রথম থেকে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির ক্ষেত্র প্রচারিকা সুনীতা হলদেকর এবং প্রাদেশিক কার্যবাহিকা শ্রীমতী মহুয়া ধর উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবনে মহিলাদের ভূমিকা ও আবশ্যকীয় করণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করেন।

সম্মেলনে ৭৫ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কৃত ভারতী’র কার্যালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন

বিদ্যার দেবী সরস্বতী বন্দনার মাধ্যমে সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করে সংস্কৃত ভারতীর পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের কার্যালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। কার্যালয়ের ঠিকানা—

২৬ নং বিধান সরণী, মাধব স্মৃতি, ত্রিতল। ফোন ২২৪১ ০৪০১।

সংস্কৃত চর্চার জন্যই গত কয়েক বছর ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে কেন্দ্র সরকারের সংস্থা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান। তারও বহু আগে থেকে সংস্কৃত ভাষার প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে সংস্কৃত ভারতী। প্রসঙ্গত বিগত প্রায় এক দশক সময় ধরে দায়িত্বের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত-র প্রচার-প্রসারের কাজ করছিলেন অভিজিৎ চক্রবর্তী, প্রণব বর, কাশীনাথ নন্দী প্রমুখ। বর্তমানে সংস্কৃত ভারতীর বঙ্গ-প্রান্তের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, সঙ্ঘের প্রচারক প্রণব নন্দ।

সংস্কৃত ভাষার প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে বাঙলার বিভিন্ন স্থানে ‘বদতু সংস্কৃতম্’ (সংস্কৃতে কথা বলা)-র কর্মসূচী নেওয়া হবে।

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই কার্যালয়ে দশ দিনের এক প্রশিক্ষণ শিবির হবে বলে প্রণব নন্দ জানান।

পরলোকে প্রবীণ প্রচারক মাধব করমবেলকর

গত ২৯ জানুয়ারি বি(ৃ হিন্দু পরিষদের উত্তর পূর্ব প্রান্তের (উত্তর অসম) আজীবন হিতচিন্তক প্রমুখ তথা প্রবীণ প্রচারক মাধব করমবেলকর ৬৭ বৎসর বয়সে, হৃদরোগে আত্র(ান্ত হয়ে স্নানঘরে স্নান সমাপনান্তে সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। প্রতিদিনের মতো ওইদিনও প্রাতঃস্মরণ, সঙ্ঘ প্রার্থনা সকলের সঙ্গে করে নিজ হাতে চা করে সবাইকে দিয়ে নিজে চা-পান করেছেন। প্রতিদিন স্নান করে পূজা করার সময় এই বয়সেও প্রথমে সূর্যনমস্কার করে, বাবা রামদেব নির্দেশিত প্রাণায়াম করতেন। গত ৪৫ বৎসর যাবৎ প্রচারক জীবনের শেষ ৩১ বৎসর অসমে কাটিয়েছেন। পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মারাঠি হয়েও অসমীয়া সংস্কৃতির ভাবধারায় জীবন গঠন করে অসমীয়া ভাষায় লেখা, পড়া এবং ভাষণ দিয়ে অসমীয়া সমাজের আস্থা ভাজন হয়েছিলেন।

শোক সংবাদ

চলে গেলেন নদীয়া জেলার বি এম - এস-এর সভাপতি স্বপন মন্ডল। গত ২৫ ডিসেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন। স্ত্রী সহ তাঁর এক পুত্র এক কন্যা বর্তমান।

পরলোকে সরযু দে

বি(ৃ হিন্দু পরিষদের শিলং মহানগরের (মেঘালয়ের রাজধানী) সভাপতি মতিলাল দে-র ধর্মপত্নী এবং সঙ্ঘ পরিবারের সকল কার্যকর্তাদের নিকট মাতৃস্বরূপা সরযু দে, ৬৯ বৎসর বয়সে হৃদরোগে আত্র(ান্ত হয়ে গত ২০.০১.০৯। এ পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, দুই পুত্র, এক কন্যা, দুই নাতনী এবং গুণমুগ্ধ আত্মীয়-স্বজনদের রেখে গেছেন।

উদাসী বাউলের সঙ্গে কয়েকটা দিন

দীপেন ভাদুড়ী

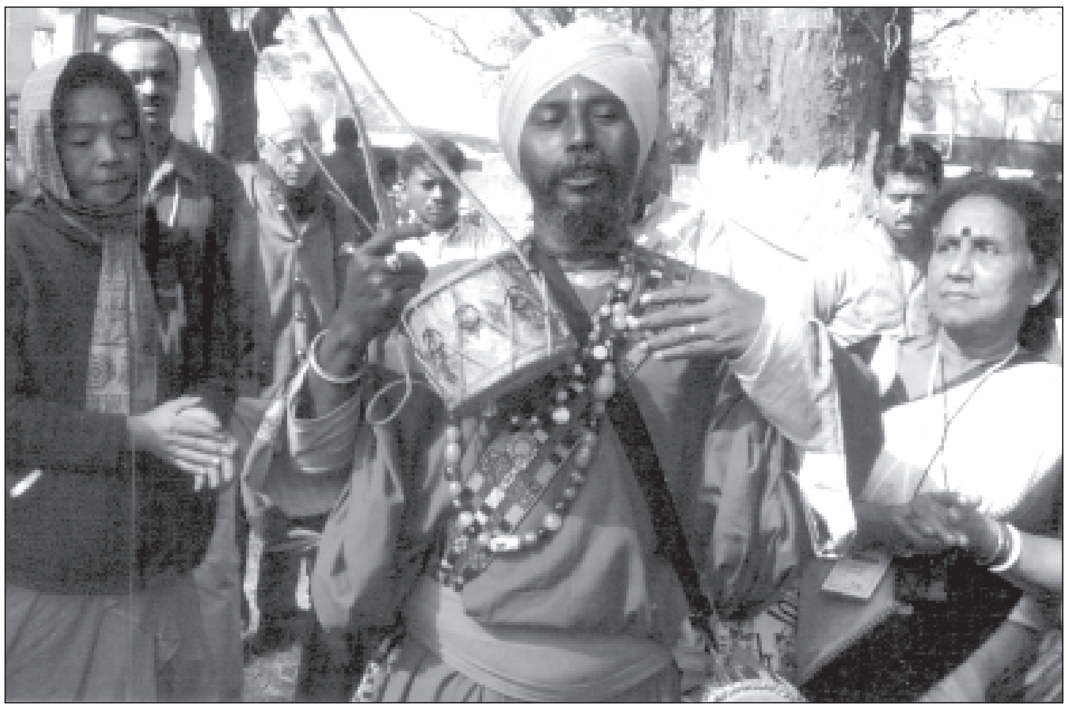

বাউল বলতেই আমাদের মনে উদয় হয় গেরুয়াধারী, বগলে গাবগুবি যন্ত্র সহ উদাসী গায়ক। অবশ্য বর্তমানে কিছু বাউলকে জিন্সের প্যান্ট পরিহিত অবস্থায়ও দেখা যায়। বাউলের আধিক্য বীরভূমের গ্রামে-গ্রামে। মুর্শিদাবাদ এবং বাঁকুড়ার কিছু কিছু গ্রামে বাউল গানের চর্চা চলছে। অনেকেই এই গানকে পেশা হিসাবে নিয়েছেন।

মনে পড়ে যায় পূর্ণদাস বাউলের একটি কথা, "বিদেশীরা স্বীকৃতি দেওয়ার আগে এবং সেখানে ব্যাপক প্রচার ও বিপুল সমাদরের পূর্বে আমাদের দেশে বাউল- সংস্কৃতি নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায়নি।"

যদিও অনেকেই পূর্ণ দাসের এই বক্তব্যর সঙ্গে সহমত হতে পারেননি। অবশ্য বিদেশী প্রচারের আলোয় পূর্ণচন্দ্র দাস এর নাম ছড়িয়ে পড়ে দেশে-বিদেশে। কিন্তু পূর্ণচন্দ্র দাসের পিতা বাউল নবনী গোপাল দাস এবং তাঁর স্ত্রী ব্রজবালা দাসীও বাউলানী হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এবং তাদের পাঁচ সন্তান অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র দাস, লক্ষ্মণ দাস, চক্রধর দাস এবং কন্যা অন্নপূর্ণা, রাধারাণী। এরা সকলেই বাউল গানে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

এই প্রতিবেদক ১৯৬০-৬১ সালে নবনী গোপাল দাসের বাউল গান কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চে শুনেছেন। তখন নবনী দাসের সঙ্গে থাকতেন বালক পূর্ণচন্দ্র দাস। বাউল গান চিরকালই জনপ্রিয় ছিল। পৌষ সংক্রান্তির জয়দেব মেলা (কেঁদুলির মেলা) বাউলদের কাছে পীঠস্থানের সমান। ১৯০৯ সালে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ও গিয়েছিলেন এই মেলায়। ১৯২৫ সালে দর্শন সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির ভাষণে বাউলের দর্শন ব্যাখ্যা করেন।

আজকাল অনেক বিদেশী মহিলা বাউল গানের সুরে মোহিত হয়ে, দেশ ছেড়ে চলে আসছেন এদেশে এবং বাউল গান শিখছেন। যেমন জাপানের ওসাকার মেয়ে মাকী কাজুমী, বাউল গায়ক সাধন দাসের সঙ্গে নাড়া বেঁধেছেন। বাউল গানের কথা বললে মনে পড়ে যায় হরিদাস গোঁসাই, মনোহর গোঁসাই, চিন্তামনি দাসী। ত্রিভঙ্গ খ্যাপা, রাধাশ্যাম দাস প্রভৃতি বাউলের নাম। যাঁরা এককালে প্রসিদ্ধ বাউল গায়ক ছিলেন।

এই প্রতিবেদক সম্প্রতি কোডারমা শহরে ৮১ তম নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। তখন সেখানে পরিচয় হয় বাঁকুড়া জেলার নবাসন বেলাতোড়ের বাউল সত্যানন্দ সম্প্রদায়ের সঙ্গে। ওঁরা মোট ছ'জন গান করেন। এঁদের পেশা এবং নেশা বাউল গান করা। এঁদের বাউল গানে সকলে মোহিত হয়ে যান। সঙ্গে ছিলেন হরিদাসী। হরিদাসী জাপানের হুকুইজেরা শহরের মেয়ে, নাম ছিল হিরোকো। ভারতে এসেছিলেন লোক সংস্কৃতির অঙ্গ বাউল গানকে ভালোবেসে- ২০০৩ সালের কেঁদুলি মেলায়। বর্তমানে সত্যানন্দ বাউলের শিষ্যত্বও গ্রহণ করে তাঁর কাছেই আছেন। বর্তমান নাম হরিদাসী। এই প্রতিবেদক হরিদাসীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন বাংলা ভাষায়। হরিদাসী এই ক'বছরে বাংলা ভাষায় প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছেন।

বাঁকুড়ার আড়রা গ্রামে, নির্মল দাস সম্প্রদায়ের দলে আছেন ৫ জন বাউল। জামেরিয়ার শচীনন্দন সম্প্রদায়ের দলে আছেন ৭ জন বাউল। যাঁরা বাউল গানকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

বাংলার লোক সংস্কৃতির এই ধারায় মোহিত হয়ে যাচ্ছেন প্রাচ্যের মানুষও। সেজন্য বাউল গানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে।

শব্দরূপ - ৪৯৭

কমলিকা সাহা

★	১	★	২	★	৩		৪
★	৫			★		★	
৬	★	★	৭			★	
৮				★	★	★	
	★	★	★	৯			
	★	১০			★	★	
	★		★	১১		১২	★
১৩			★		★		★

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ৩. জল পান করার পাত্রবিশেষ, ৫. বালক বয়সে শ্রীকৃষ্ণ-এর নাম, আগাগোড়া বৃত্তাকার, ৭. হাত কাটা ছোট জামা বিশেষ, ৮. দেশি শব্দে ইঁটের টুকরো, প্রথম দুয়ে নলিতা, ৯. জ্যোতিষী মতে নবম ও অষ্টম গ্রহ, ১০. প্রতিশব্দে বিশেষণে সুমধুর, সুধাময়, শেষ দুয়ে মিঠা, ১১. দেবতার মূর্তি, দেব প্রতিমা, শেষ দুয়ে বঙ্গীয় প্ল্যানেট, ১২. বিশেষণে লোলুপ, লোভী।

উপর-নীচ ঃ ১. "— আমার শোলক বালা কাজলা দিদি কই", ২. এই দুটো জিনিস গাছে হয়ে থাকে, আগাগোড়া পুষ্প, ৩. সন্ন্যাসীদের পরিধেয় বস্ত্রের রং, ৪. মনসা মঙ্গলের দুই প্রধান নারী চরিত্র, ৬. বঙ্কিমচন্দ্র-এর মলাট-এর এক নায়িকা, আগাগোড়া কদলী, ৯. বিশেষণে গণ্যমান্য ব্যক্তি, প্রথম দুয়ে কৃষ্ণ, ১০. সৌরভ, তবে ক্রিকেটার নয় উত্তম গন্ধ, ১২. বিষ্ণু।

সমাধান শব্দরূপ ৪৯৫

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯।

■	■	সা	র	দা	দে	বী	■
■	■	■	শ্মি	■	■	র	■
ঢা	ক	■	পা	ণি	ত	ক	■
■	ল	লি	ত	■	ক্ষ	■	■
■	■	কা	■	ম	ক	র	■
■	ক	র	তা	ল	■	মা	লা
■	ং	■	■	মা	■	■	■
■	স	মু	দ্রা	স	ণ	■	■

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ২ মার্চ ২০০৯ সংখ্যায়।

লোক সংস্কৃতির অঙ্গ রণপা-নাচ

দীপেন ভাদুড়ী।। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমানের কিছু অংশে "রায়বেঁশে" নাচের প্রচলন ছিল। আজ রায়বেঁশে নাচের শিল্পী খুঁজে পাওয়া যায় না। নাচগানের সঙ্গে শারীরিককসরত দেখিয়ে রায়বেঁশে নৃত্যের শিল্পীরা দর্শকদের মনোরঞ্জন করতেন।

রায়বেঁশে নৃত্যের কথা বললেই মনে পড়েযায় বীরভূমের ভাগ্যধর ভুঁইমালি, ভালাসের প্রহ্লাদ মাঝি এবং মুর্শিদাবাদের স্বপন হাজরার নাম করতেই হয়, যাঁরা একসময় রায়বেঁশে নৃত্যকে জনপ্রিয় করেছিলেন।

বাংলার লোকশিল্পের একটি বিভাগ নৃত্য। "নাটুয়া", "পাইক", "ঘোড়ানাচ", "রণপা", 'কাঠিনাচ" ক্রমে ক্রমে লোক সংস্কৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। সাধারণত এ সকল নৃত্য যুদ্ধে র আঙ্গিকে সৃষ্টি হয়েছিল — বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য। একসময় মুখোশ পরে "ছৌ নাচ" জনপ্রিয় ছিল। এখনও অবশ্য কিছু কিছু জায়গায় বিশেষত বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় এই নাচের কিছু শিল্পী এই নাচকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন।

রণপা নাচও অতীতে জনপ্রিয় ছিল। বর্তমান বংশধররা এই নাচ শেখার আগ্রহ ক্রমশ হারিয়ে ফেলছেন। আগে যাঁদের জীবিকা ছিল এই সব নাচ, বর্তমানে তাঁদের বংশধরেরা অন্য জীবিকায় চলে যাচ্ছেন। কারণ এই জীবিকা জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলছে। সরকার পরিচালিত লোক সংস্কৃতির অনুষ্ঠান ব্যতীত এই নাচ দেখা যায় না, বাংলার লোক সংস্কৃতির অঙ্গ এই সব নাচ আজ বিলুপ্তির পথে।

ঝাড়খন্ডের এক অনুষ্ঠানে এই প্রতিবেদকের সঙ্গে পরিচয় হয় একদল রণপা নাচের শিল্পীর সঙ্গে। যাঁদের সেদিনের বণপা নাচ ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। তাঁরা এই নাচকে ভালোবেসে পিতৃপুরুষের স্মৃতি ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। এঁরা কেউ চাষ করেন, কেউ অন্য জীবিকার মাধ্যমে সংসার প্রতিপালন করেন। এই প্রতিবেদকের প্রশ্নের উত্তরে বড়লাঠিয়াল বিকাশ মাহাতো জানালেন তাঁদের দলে ৩২ জন শিল্পী আছেন। সকলেই শিক্ষিত। এই নাচ তাঁরা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন। তাঁরা সফল হবেন এ বিশ্বাস তাঁদের আছে।

বাঁকুড়া জেলার এই দলটির প্রধান বাজনদারের নাম রাধেশ্যাম সহিস। সাধারণত ঢোল বাজান। ধামসা বাজান বিমল মাহাতো। মাদল মন্টু সহিস, এ ছাড়াও নৃত্য শিল্পী বিকাশ কর্মকার, নয়ন সহিস, জয়দেব টুডু প্রভৃতি। এই শিল্পীরা ১৯৯৩ সালে এই দল গঠন করেছেন এবং অনলস চেষ্টায় আজ এক বড় দলে পরিণত করতে পেরেছেন। তাঁরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন যাতে দলে বর্তমান প্রজন্মের আরও নতুন নতুন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। বাঁকুড়া জেলার মহেশপুরের এই দল ব্যতীত আরও দলের সন্ধান দিলেন দিলীপ মাহাতো। যেমন খেরিয়া, মহেশপুর, প্রপার, কোচা প্রভৃতি গ্রামে অনেক দল বর্তমানে চেষ্টা করে যাচ্ছেন পিতৃপুরুষের এই শিল্পকর্মকে আবার জনপ্রিয় করার।

এবারের সংগ্রাম নির্ভুল, নির্দ্বিধ ঐক্য-সংহতি রক্ষার সংগ্রাম

বিশাখা বিশ্বাস

অবশেষে ডুবন্ত তরণীখানির কটিদেশ ভাঙা মাঝি-মাল্লারা খুঁজে পেতে তাকেই এনেছে, তাকেই দিতে দিতে মুক্তোমালা স্বপ্ন দেখেছে। তিনি আসছেন। দিনে সবুজ রাতে লাল এরাজ্যের তরমুজ ক্ষেতের ফাংগাস ধরা লতায়-পাতায় ভোটের আগে আবার লেগেছে সবুজের দোলন; তিনি আসছেন।

তিনি সত্যিই আসছেন। চীনা অলিম্পিকে পাখির বাসায় হাজার রাত্রির রোশনাই দেখে একদিন শান্তির নীড়ে বিশ্বহৃদয়ের স্পন্দন শুনে আনন্দে আন্ডারপ্যান্ট এবং অন্তর্বাস খুলে ফেলেছিল, চীন ভ্রমণকালে চীনা অফিসারদের তল্লাসিতে নিজের ইনারপ্যান্টটি পর্যন্ত খুইয়ে লালবাংলার এতাবৎকালের সেই ঘরের লোক এবারের আবর্তনে-বিবর্তনে আমাদের লোক হয়ে, এরাজ্যের তরমুজদের অভিভাবক হয়ে আসছেন শুনে, এরাজ্যের সেই সব ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়্যালিস্টরা আহ্লাদে-উল্লাসে তাই গান ধরেছে ঃ দুধ দিয়েছি কলা দিয়েছি / কলার সাথে মূলো দিয়েছি / জানি তুমি কর্বে নাকো বেইমানী / তোমায় মানি গুণমণি স্তবের স্তুতিতে জীবলোকের দেবতা শিবও তুষ্ট হন। লালমামাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে, নরলোকের ভাগ্নে-ভাগ্নীরাও কী করে 'রা' না কেড়ে পারেন?

অতএব, তিনিও সগৌরবে গান ধরেছেন ঃ মোর নাম এই বলে পরিচিত হোক — আমি তোমাদেরই লোক।

এরাজ্যের লালদের দিন ফুরিয়ে আসছিল। মানুষের রক্ত ঝরিয়ে লাল পতাকার সবটুকু রক্ত কেড়ে নিয়ে, লালপন্থীদের রক্তিমাভ সূর্য এখন অস্তাচলে চলছিল। কিন্তু, হঠাৎ কীসে যে কী হল। হঠাৎ কার কোন মন্ত্র কার যে কানে এলো! বুলিতে বুলেটের আগুন ঝরিয়ে তরমুজ পার্টির তিন পাট্টাদার দিল্লীতে নেত্রীর কাছে ছুটলো। 'কী মন্ত্র কহিলেন তিনি তাহাদের কানে — লালপন্থীদের বিশ্বস্ত সেবাদাস-সেবাদাসীরা জোটপন্থী বিরোধিদের মুন্ডপাতন শুরু করে দিল। লালবাদীদের ঘোঁটপন্থী 'ভাগ্নে'-দের কেউ বললেন, জোট হতে হবে সম্মানজনক শর্তে। কেউ বললেন, জোটের নেত্রীকে বলতে হবে তিনি ভোটের পরে এনডিএ-তে যাবেন না। উত্তর থেকে শীতার্ত উত্তুরে বাতাসে ভেসে এসে বড় মাপের লাল-পাড় শাড়ি আর চাঁদের চেয়েও বড় মাপের টিপ চাঁদ-কপালের মধ্যস্থলে বসিয়ে কেউ বললেন, অবমাননাকর শর্তে জোট নয়, কদাচ নয়।...

লালেদের তরমুজ ভাগ্নে-ভাগ্নেবৌরা বলে কী! জোটের প্রস্তাব কে দিয়েছে তাদের? কে বা কারা কবে দিল তাদের কোন জোটের শর্ত? এনডিএ-তে যাবার কথা কারা বললেন কখন? 'ওপরে সবুজ ভেতরে লাল' লালমামাদের ভাগ্নে আর ভাগ্নেবৌ-রা কণ্ঠনালিকা ঝরঝরে করে বলেছে কী যে, তারাও ভোটের পরে তাদের বিদেশিনী জননী আর হাফ-স্বদেশী কুট্রিভাইটি-রা কেউ ধরবে না লালবান্ধবদের হাত? লালমামারা কেউ কী কখনও কোনও ভাগ্নেদের বলেছে যে, ভোটের পরই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিহত করতে বিগত মাস ক'টির বিরহের বকুল আবার বিবাহবাসরের রজনীগন্ধা হয়ে মিলনের সৌরভ ছড়াবে না? — না। তা তারা কেউ বলেনি।...

অতএব, লালবাংলায় বিরোধিদের আকাশ যেখানে মাটি ছুঁয়ে বামবাদকে তাক্ করে বারুদগন্ধ ছড়াচ্ছিল, লালা-দিগন্তে মেঘের বুকে বিদ্যুতে যেখানে ঝিলিক মারছিল, লালপন্থীদের জয়ের স্বপ্ন যেখানে যুদ্ধের আগেই সমাধিপ্রাপ্ত হয়ে চলছিল — সেইসবখানে তরমুজ ভাগ্নে-ভাগ্নে-বৌদের সহযোগিতায় লালমামারা শরীরে নতুন রক্ত পেয়ে নয়াবলে বলীয়ান হয়ে আসরে নেমে আনন্দে গান ধরেছেন ঃ ওই হাঁকছে সুদূর নীল গগন / ওই হাতছানি দ্যায় জয়ের স্বপন / ওরে, লাগরে, লাগ্ ভেল্কি লাগরে।...

তা, ভেল্কি লেগেও গেছে। তরমুজ পার্টির বিধাতা হয়ে বিধাত্রীর অনুমোদন নিয়ে বঙ্গীয় কংগ্রেসের অন্তর্জলি যাত্রার শেষ আয়োজনটুকু সমাপ্ত করে লালদুর্গের ঋণ পরিশোধ করতে তিনি আসছেন। তার আসার খবর শুনেই দিকে দিকে জোট বিরোধী খেউড় শুরু হয়ে গেছে। চিরকালের লালেদের অন্নলালিত ঘোঁটপন্থীরা জোটবিরোধী খিস্তি শুরু করে দিয়েছে। তিনি আসছেন শুনেই বর্ষার ভেকেরা ডাকাডাকি শুরু করেছে, বসন্তের কোকিলরা গান ধরেছে, ভোরের প্রভাত পাখীরা আবার কিচির-মিচির শুরু করেছে ঃ সম্মানজনক শর্তে জোট চাই ... জোটের আগেই শর্ত চাই ....

সাম্প্রদায়িক শান্তির সেনারা জমায়েত হয়েছে ঘাসের বনে, ফুলের শয্যায়। সিপিএম-এর কোলের লালু-ভুলুরা সিপিএম-কে নিয়েই ভোটের পরে গড়বে ঘর গড়ার জোট। কংগ্রেসী মনমোহিনী-র মনোটনাস মনোটনে সিপিএম মেরামত করে নেবে ইউপিএ সরকার থেকে তার সমর্থন প্রত্যাহারের ক্ষত ও খেসারৎ। ঝড়ের বাতাসে কলাপাতার কাঁপনের মতো প্রচারে-বক্তব্যে জনগণের চেতনার স্তরে আলোড়ন তোলার ক্ষেত্রে বিজেপি-র দক্ষ ও বাগ্মী নেতা-নেত্রীদের রাজ্যের গ্রাম-গঞ্জের মানুষকে বাম-কং সম্ভাব্য মাখামাখির কথা তুলে ধরতে হবে।

আকাশে-বাতাসে উঠেছে পরিবর্তনের ঢেউ। দিন বদলের এই দাবিকে অস্বীকার করতে পারছেনা কেউ। বদল ঘটবেই। জীবন্ত মানুষের সজীব গতিধারায় একক লড়াইতেই জনগণের স্বার্থ, গণতন্ত্র, হিন্দুর সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভিনবত্ব এবং বৈশিষ্ট্যকে এবারের গণরায়ে তুলে ধরতে হবে তাই। ক্ষেত্র প্রস্তুত। তৈরি রয়েছে অশ্বমেধের ঘোড়া। এখন দক্ষ ও যোগ্য অশ্বারোহী চাই। মনে রাখা দরকার, এবারের সংগ্রাম জনগণের সাথে নির্ভুল নির্দ্বিধ ঐক্য রাখার সংগ্রাম। ক্ষুদ্র তবু একক শক্তিতে আমরা যে অমর, এবারের সংগ্রামে যেন রেখে যেতে পারি সেই স্বাক্ষর।

চাই সুস্থ মাতৃত্ব

(১২ পাতার পর)

মহিলাদের যত্ন নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সবই কথার কথা। নিয়মিত দেখভালে দেখা যায় নার্সদের নিরুৎসাহিতা, অবহেলা, বিরক্তি প্রকাশ। সাধারণভাবে যার অস্বাভাবিকতা দেখা যায় তা চেপে যায় এরা। গর্ভাবস্থায় যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে একমাত্র শিক্ষিতা সন্তানসম্ভবা মায়েরা সচেতন হয়।

এ ব্যাপারে অবশ্যই বাংলাদেশ, ইউ কে এবং মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলির কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। কারণ, সেখানে অত্যন্ত উন্নতমানের কাজ করা হচ্ছে গর্ভবতী মহিলাদের সুস্থ ও নিরাপদ রাখার ব্যাপারে। যেসব দেশগুলিতে আশি শতাংশ মহিলাদের ক্ষেত্রে একমাত্র নার্সই সব দায়িত্ব গ্রহণ করে। চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞরো ঝুঁকিপূর্ণ আশঙ্কাজনক অবস্থায় দায়িত্ব নেন। ভারতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবায় দুটিটিটেনাস টক্সাইড দেওয়া জরুরি প্রতিটি ভারতীয় গর্ভবতী মহিলাদের সময়মত, যখন সে প্রসবাসন্ন হয়। যদি এই অবস্থায় নিয়মিত দেখাশোনা বজায় রাখা যায়, অন্তত নববই ভাগ গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে তাহলে তারা রক্তহীনতা থেকে রেহাই পেতে পারে।

কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত গর্ভবতী মহিলাদেরও সচেতন থাকতে হবে — এই অবস্থায় কোনও ওষুধ না খাওয়ার ব্যাপারে। অতিরিক্ত ওষুধ সেবনে অস্বাভাবিক সন্তান জন্মের সম্ভাবনা।

সবশেষে এটাই বলার যে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের একসঙ্গে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। যত্ন নেওয়া এবং অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ বন্ধ করতে পারলে সমাজ সুস্থ শিশু তথা সুস্থ মায়েদের নিয়ে সুন্দর হয়ে উঠবে।

প্রাচীন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ধারণা

(১১ পাতার পর)

বলেছেন,

"ভূতাঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রতিদৈবসিকৌ।
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্।।'

অর্থাৎ, পৃথিবী ঘূর্ণায়মান বলেই প্রতিদিন গ্রহ-নক্ষত্রগণ উদয় হয় এবং অস্ত যায়। প্রকৃতপক্ষে সকল নক্ষত্র মণ্ডল স্থির।

কোপারনিকাসের জীবনকাল ১৪৭৩ থেকে ১৫৪৩ খৃস্টাব্দে। এর প্রায় দু'হাজার বছর আগে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচিত হয়েছিল। সেখানেও উল্লেখ আছে যে সূর্যের উদয় বা অস্ত বলে কিছু নেই। যে সর্বদা বিরাজমান 'স বা এষণ কদাচনাস্তমেতি নোদেতি'। বিষ্ণুপুরাণেও একই কথা বলা হয়েছে — সূর্যের অস্তগমন বলে কিছু নেই। 'দর্শন' এবং 'অদর্শন'-কেই আমরা 'উদয় বা অস্তগমন' বলে ধরে নিই। বাস্তবিক সূর্য সর্বদা আছে।

এতো গেল পৃথিবীর আবর্তন এবং ঘূর্ণনের কথা। দিন এবং রাত্রির কথা। সূর্যের উদয় এবং অস্তগমনের কথা। এছাড়াও বৈদিক যুগের পন্ডিতগণ পৃথিবী সম্পর্কে আর কী চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন? এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে সে যুগে মানুষের হাতে কোনও উন্নত প্রযুক্তি ছিল না। গ্যালিলিও-র আগে কোনও দূরবীণ ছিল না। খালি চোখে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে, গণিতের সাহায্যে এবং চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হত। সমগ্র পৃথিবীকে না দেখে পৃথিবী আকৃতি সম্পর্কে ধারণা করা বেশ কঠিন কাজ। আর যখন দেখি আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে প্রাপ্ত ফলের সঙ্গে সে ফল প্রায় মিলে যাচ্ছে, তখন বিস্ময়ে হতবাক্ হতে হয়। কেমন ছিল বৈদিক যুগে পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে ধারণা? শতপথ ব্রাহ্মণে পৃথিবীকে পরিমণ্ডল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আপস্তম্ব প্রভৃতি সূত্রে 'পরিমণ্ডল' শব্দটি গোলাকার বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বলা যায় বৈদিক যুগের ঋষিদের ধারণায় পৃথিবী বর্তুলাকার।

আর্যভট্টও মনে করতেন পৃথিবী গোলাকার। একটি উপমার সাহায্যে পৃথিবীর আকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন —

"যদ্বৎ কদম্বপুষ্পগ্রন্থিঃ প্রচিতঃ সমন্ততঃ কুসুমৈঃ।
তদ্বদ্ধি সর্বসত্ত্বৈর্জলজৈঃ স্থলজৈশ্চ ভূগোলঃ।।

অর্থাৎ, পৃথিবী কদম্ব ফুলের মতো গোলাকার। আর তাকে ঘিরে রয়েছে নানা ধরনের স্থলজ ও জলজ জন্তু।

পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তন নিয়ে আর্যভট্টের সঙ্গে বরাহমিহিরের যতই মতভেদ থাকুক, পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে দু'জনে একমত ছিলেন। তিনি বলেছেন, "ভূগোল তারাগণ মধ্যে শূন্যে বর্তুলাকারে অবস্থিত"।

পৃথিবী গোলাকার। অথচ আমরা একে সমতল দেখি। কেন? এর উত্তরে ভাস্কারাচার্য বলেছেন,

"সমো যতঃস্যাৎপরিধেঃ শতাংশঃ
পৃথ্বী চ পৃথ্বী নিতরাং তনীয়ান্।
নরশ্ব তৎপৃষ্ঠগতস্য কৃৎস্না
সমেব তস্য প্রতিভাত্যতঃ সা।।"

বিশাল একটি বৃত্তের পরিধিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করলে প্রতি ক্ষুদ্র একটি ভাগকে বক্র বলে মনে হয় না। পৃথিবী প্রকান্ড। তুলনায় মানুষ অতি ক্ষুদ্র। তাই পৃথিবীর পৃষ্ঠতলে দাঁড়িয়ে যতটুকু দৃষ্টি যায় তা সমগ্র পৃথিবীর তুলনায় অতি ক্ষুদ্র অঞ্চল। তাই আমাদের দৃষ্টি গোচরীভূত অঞ্চল সমতল মনে হয়।

পৃথিবীর ব্যাস নির্ণয় প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আর্যভট্ট পৃথিবীর ব্যাসের যে পরিমাপ দিয়েছিলেন তা হল ১০৫০ যোজন। বরাহমিহিরের মতে পৃথিবীর ব্যাস হল ১০১৯ যোজন। ব্রহ্মগুপ্তের মতে এই ব্যাসের পরিমাপ ১৫৮১ যোজন। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য পৃথিবীর ব্যাসের যে মান নির্ণয় করেন তা হল, ১৫৮১ $^{১}/_{২৪}$ যোজন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র মতে ১ যোজন ঞ্চ ৪৬/১১ মাইল অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার মাইলের সমান। এই হিসেব অনুযায়ী আর্যভট্ট নির্ণীত পৃথিবীর ব্যাস দাঁড়ায় ৪৭২৫ মাইল। বরাহমিহির নির্ণীত ব্যাসের পরিমাণ ৪৫৪৫ $^{১}/_{২}$ মাইল। ব্রহ্মগুপ্ত এবং দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য ব্যাসের যে পরিমাপ করেছিলেন মাইল-এর এককে পরিবর্তন করলে তা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭১১৪ $^{১}/_{২}$ মাইল এবং ৭১১৪ $^{৬৯}/_{১০}$ মাইল। প্রাচীনকালে পৃথিবীকে গোলাকার মনে করায় ব্যাসের পরিমাণ সর্বত্র একই ধরা হত। বর্তমানে আমরা পৃথিবীর যে ব্যাস নির্ণয় করেছি তার পরিমাণ বিষুবরেখা অবলম্বনে ৭৯২৭ মাইল এবং মেরু অবলম্বনে ৭৯০০ মাইল।

প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আর একটি অনন্য কৃতিত্ব হল পৃথিবীর উপরিভাগে বায়ুমণ্ডলের বিস্তৃতি নির্ণয়। এইপ্রসঙ্গে ভাস্করাচার্য লিখেছেন, 'ভূমিবর্হির্দ্বাদশ যোজনানি' — অর্থাৎ, পৃথিবীর ঊর্দ্ধ ভাগে দ্বাদশ যোজন পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত আছে। দ্বাদশ যোজনকে মাইলে রূপান্তর করলে পঞ্চাশ মাইলের কাছাকাছি দাঁড়ায়। আধুনিক হিসেবে ট্রপোস্ফিয়ার ছবজ্জপ্সম্মপ্সব্দম্মড়ন্দ্বজ্জন্দ্বগ্ন এবং স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মিলিত বিস্তৃতি পঞ্চাশ মাইলের মতো।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা একথা বলতে পারি যে, প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা যথেষ্ট উন্নত ছিল।

প্রণবানন্দের দৃষ্টিতে ধর্ম

(১১ পাতার পর)

মধ্যে নিষ্কাম কর্মের জোয়ার উঠেছিল। সেই তুমুল স্রোতে বিশ্বমানব পরিপ্লাবিত। জগৎ সংসার ডুবুডুবু। সাধনার চরম সীমায় উপনীত হয়ে তিনি পরিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। জীব-কল্যাণের আবেগের ফলে পরার্থে আত্মনিবেদনের পন্থা শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছিল। আর জ্ঞানের জন্য বাক্সংযমী হয়ে শান্ত সমাহিত ও ধ্যানস্থ থাকতেন। লক্ষ্য-সত্যলাভ, ঈশ্বরের অস্তিত্বের সন্ধান করা।

'দেশ-জাতির সামনে দাঁড়াবার মতো উপযুক্ত নেতার সন্ধান পেলাম'। আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে স্বামী প্রণবানন্দ এ কথা বলেছিলেন। ডঃ মুখোপাধ্যায়ও স্বামী প্রণবানন্দ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধ সত্যকে চেপে রাখতে পারেননি। তাঁর কথায় — "প্রণবানন্দজী প্রচলিত অঙ্গহীন হিন্দুধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দুজাতিকে যুগোচিত মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, তিনি আমার প্রথম রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ প্রেরণা ও শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। আজও আমি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি এই বিরাট পুরুষের সুমহান ব্যক্তিত্ব, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তেজব্যঞ্জক পৌরুষ ও আধ্যাত্মিক শক্তির কথা।"

সুতরাং, শুধুমাত্র ধর্মকর্মের মধ্যেই নিজেকে যে নিয়োজিত রেখেছিলেন তা নয়, দেশকে বাঁচানোর তাগিদে রাজনৈতিক মঞ্চে ও অল্পস্বল্প বিচরণ করেছেন। 'আমি হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাক দিতে চাই', হিন্দুজাতিকে উদ্দেশ্য করে তিনি এভাবে বারবার ডাক দিয়েছেন। গড়েছেন হিন্দুর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য হিন্দু মিলন মন্দির। তা বলে অন্য ধর্মের প্রতি কোথাও তাঁর বিরূপ মন্তব্য পর্যন্ত শোনা যায়নি। বরং চাইতেন হিন্দুধর্মের পরধর্ম সহিষ্ণুতার মতো সকল ধর্ম একই খাতে বয়ে চলুক। মুছে যাক আবিলতা ও পঙ্কিলতা। ধর্ম হোক মানবতার প্রতীক! নবরূপে আবার বিশ্বমানবের জাগরণ হোক! হৃদয়ে হৃদয়ে গড়ে উঠুক মহামিলনের সেতু। আকাশে বাতাসে ধবনিত প্রতিধবনিত হোক মহামিলনের সুর! একাকার হয়ে ভেসে যাক মহাসমন্বয়ের দুর্নিবার প্রবাহে! তবেই হবে ধর্মের সার্থকতা।

Swastika
16 February - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

মোদীকেই সামনে রাখছে দল

(১ পাতার পর)

খেটে খাওয়া মানুষজনই হাতে কলমে করেছেন।

নরেন্দ্র মোদীকে মিডিয়া মুসলমানদের ঘাতক শত্রু বলে চিহ্নিত করেছে। কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী তাঁকে 'মউত কা সওদাগর' বলেছেন। কিন্তু গুজরাতে মুসলিমরা মোদীকে কী চোখে দেখেন তার নমুনা পাওয়া যাবে ইংরেজি দৈনিক ''হিন্দুস্থান টাইমসের'' সাংবাদিক নীলেশ মিশ্রের সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে। আমেদাবাদের কাছে দুটি মুসলিম এলাকায় তিনি সরেজমিন তদন্তে গিয়েছিলেন। প্রথমে জামালপুরে। সেখানের মানুষ স্পষ্টভাষায় বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সারা গুজরাতে যে উন্নয়ন ঘটেছে সেখানে হিন্দু — মুসলমানের গ্রামকে আলাদাভাবে দেখা হয়নি। মাত্র দু'-চার বছরে জামালপুর এলাকায় পাকা রাস্তা, স্কুল-কলেজ, ছোট-মাঝারি শিল্প, পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা যেভাবে গড়ে উঠেছে তা বিগত ১০০ বছরে হয়নি। সাংবাদিকরা কাগজে কী লিখছেন জানি না। তবে জামালপুরের মুসলমানরা নরেন্দ্র মোদীর রাজত্বে নিরাপদে সুখে শান্তিতে বাস করছেন। নীলেশ এরপর যান রাজ্যের অন্যতম বড় মুসলিম প্রধান ছারোদি গ্রামে। সেখানের মুসলিমরা বলেছেন, মোদীর জন্যই আজ তাঁদের গ্রামে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। সেচের জন্য প্রতিদিন ৮ ঘন্টা কম মাসুলে তাঁরা বিদ্যুৎ পান। ছারোদি গ্রামে ছেলেদের ও মেয়েদের শিক্ষার জন্য সরকারি স্কুল হয়েছে। সব স্কুলেই প্রাথমিক স্তর থেকে কমপিউটার শিক্ষা চালু করা হয়েছে। গুজরাতের সর্বত্র এমনকী প্রত্যন্ত গ্রামেও এখন ব্রডব্যান্ড সার্ভিস পাওয়া যায়। মুসলিম প্রধান গ্রাম বলে ছারোদিকে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। নীলেশ তাঁর প্রতিবেদনে এমন আরও উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে গুজরাতের মুসলমানরা নরেন্দ্র মোদীকে তাঁদের ত্রাণকর্তা বলে মনে করেন। অথচ মিডিয়া এবং বিজেপি-বিরোধী রাজনৈতিক প্রচারে মোদী 'মউত কা সওদাগর'। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানেন না যে উন্নয়নের নিরিখে গুজরাত আজ দেশের এক নম্বর রাজ্য। আমেদাবাদের খ্যাতনামা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের অধ্যাপক রবীন্দ্র ঢোলাকিয়া বলেছেন, গুজরাতে বাৎসরিক কৃষি উন্নয়নের হার এখন ১০ শতাংশ। সেখানে জাতীয় উন্নয়ণ থমকে আছে ৩ শতাংশে। রাজ্যের খরাক্লিষ্ট এলাকায় এখন সেচের জল সহজলভ্য।

নাগপুরে বিজেপির অধিবেশনে যোগ দিতে এসে এল কে আদবানী ও রাজনাথ সিং সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের প্রতিমূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করছেন।

জীবনযাত্রায় সুখ সুবিধা আজ গ্রামের মানুষ যতটা পায় তেমনটি আমেদাবাদ বা গুজরাতের অন্য বড় শহরের মানুষ পান না। কাজের আশায় একসময় যাঁরা গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়েছিলেন তাঁরা আবার গ্রামে ফিরে গেছেন। এ যেন এক স্বপ্নের রূপকথা।

হ্যাঁ, ঠিক এখানেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ভুল করেছেন। নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের মতো কৃষি নির্ভর এলাকায় শিল্প গড়তে গিয়ে তিনি কৃষি ও শিল্প দুইই ধ্বংস করেছেন। বুদ্ধদেববাবুদের উন্নততর বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে আজ এক দুঃস্বপ্ন। তাই 'উন্নয়নের দূত' নরেন্দ্র মোদীকে প্রচারে সামনে এনে বিজেপি এবার নির্বাচনে লাভবান হবে।

সুনামির চার বছর পরেও ওরা ঘরছাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। চার চারটে বছর পেরিয়ে গেল। চার বছর আগে ২০০৪-এর ২৬ ডিসেম্বর প্রকৃতির ধ্বংসলীলার এক ভয়ঙ্কর নাম সুনামি। কয়েক লহমায় অনেক কিছু ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। আজ ঝড় থেমেছে, প্রকৃতি শান্ত, তবে সুনামি বিধ্বস্ত বহু মানুষ শান্তিহীন, ঘরছাড়া। তামিলনাড়ু, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ, পন্ডিচেরী, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বেশ কিছু অঞ্চলের সুনামি কবলিতরা আজও ঘরছাড়া, আর নতুন ঘর দেওয়ার ভরসাগুলো 'প্রতিশ্রুতি'র শো-কেসে সাজানো। ঘরছাড়ারা আজ স্থানীয় সালিশির দ্বারস্থ। যদিও গত চার বছর ধরে সরকারের কাছ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা এসেছে উদ্ধার ও পুনর্বাসনের জন্য। সবচেয়ে শোচনীয় ঘটনা ১০,০০০ ঘর তৈরির টার্গেট নিয়ে কাজে নামলেও কেবল আড়াইশো ঘর আন্দামান ও নিকোবরের সুনামি কবলিতদের তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। একশো'র বেশি পরিবার এখনও আপদকালে মাথা গোঁজার ঠাঁই পায়নি।

এই ট্রাজেডি'র চতুর্থ বর্ষপূর্তির ঠিক কয়েকদিন আগে ১৮ ডিসেম্বর চেন্নাইতে সুনামি পরবর্তী পুনর্নির্মাণ প্রকল্পে নিযুক্ত ন্যাশনাল পিপলস্ ট্রাইবুনাল বেশ কিছু আশ্চর্য তথ্য জানিয়েছে। মুম্বাই হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এইচ সুরেশের নেতৃত্বে গঠিত এই ট্রাইবুনালের একটি 'পাবলিক এনকোয়ারি'র পরে জানা যায় যে তামিলনাড়ুর বেশ কিছু অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্তরা এখনও জল, আলো, রাস্তার মতো বুনিয়াদী সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত। যাতায়াতের রাস্তা এখনও ভাঙা-চোরা, এবড়ো-খেবড়ো, ওষুধপত্রের সহজলভ্যতা তো অনেক দূরের কথা। যারা যারা অস্থায়ী কিছু ঘর-বাড়ি পেয়েছে, তাদের ঘরগুলোর চারধারে এখনও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। এই ট্রাইবুনালে তামিলনাড়ু, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ, পন্ডিচেরী ও আন্দামানের বিভিন্ন অঞ্চলের পুনর্বাসনের সমস্যা নিয়ে পনেরো জন অনেকগুলো হলফনামা জমা দিয়েছেন। হলফনামাগুলিতে সবিস্তারে ঘরছাড়াদের অভিযোগের কথা বলা আছে। ওরা চার বছর পরেও সর্বহারা।

টাইবুনালের বক্তব্য, তারা সুনামি কবলিত বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখেছেন সুনামি পীড়িতদের দেওয়া সাহায্য যথেষ্ট নয়। যে সমস্ত বাড়ি-ঘর করে দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা যৎসামান্য, উপরন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সেগুলোতে মরচে পড়ছে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অবস্থা সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত। সুনামির প্রকোপে পড়া পরিবারগুলো এখনও 'অস্থায়ী আশ্রয়ে আছে' বলে এই দপ্তর জানিয়েছে। উদ্ধার কাজের জন্য দেওয়া টাকাতে লাভালাভ খুব একটা এখনও হয়নি। ভারতের ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অর্থ এসেছে মোট ১১,৯০৭ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে ৩,৬৪৪ কোটি ৫ লক্ষ টাকা এসেছে শুধু রাজীব গান্ধী রিহ্যাবিলিটেশন প্যাকেজ থেকে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা এসেছে বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা থেকে এবং ৪,৬৫২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা দিয়েছে বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলো। অন্যদিকে স্থায়ী গৃহনির্মাণ প্রকল্প খাতে দেওয়া হয়েছে ৭৫২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। স্থায়ী পরিকাঠামো উন্নয়ণের জন্য বরাদ্দ সাড়ে আটশো কোটি টাকারও বেশি।

ট্রাইবুনাল আরও দেখিয়েছে যে পার্লামেন্টের পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটি (PAC) তাদের ২০০৭-০৮-এর রিপোর্টে বলছে, রাজ্যকে সুনামি ক্ষতিগ্রস্তদের উন্নয়ণের জন্য দেওয়া টাকা-পয়সা, বিভিন্ন দিকে নয়ছয় হয়েছে। গত বছর ২৫ এপ্রিল পার্লামেন্টে দেওয়া রিপোর্টে প্যাক বলেছে যে অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, তামিলনাড়ু এবং কেন্দ্রশাসিত আন্দামান ও নিকোবরের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুদানের টাকার প্রায় ২৩০ কোটি টাকা তছরূপের খবর পাওয়া গেছে।

'ভুল পর্যবেক্ষণ, উদ্ধার কাজে টার্গেট পূরণে অক্ষমতা এবং সুনামি পীড়িত নয় এরকম বেশ কিছু মানুষকে সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে বলে প্যাকের অভিযোগ। ক্যাগ (কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল) তার পারফরমেন্স অডিটে বলেছেন, 'সুনামির উদ্ধারকাজের একটা বিশ্লেষণ করে জানা গেছে উদ্ধারের জন্য কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার প্রাথমিক অনুমানেই অনেক ভুল ছিল। ক্ষতিপূরণের পদ্ধতিতে অনেক জটিলতা ছিল।' ক্যাগ আরও বলেছে, স্থায়ী আবাসন তৈরি করার কাজ বেশ কিছুদিন ধরে ঝুলেছিল, কারণ নির্দিষ্ট জমি পেতেও কোনও পরিকল্পনা করা হয়নি। গোদের উপর বিষফোঁড়া হল — কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থবন্টনে দেরি করা।

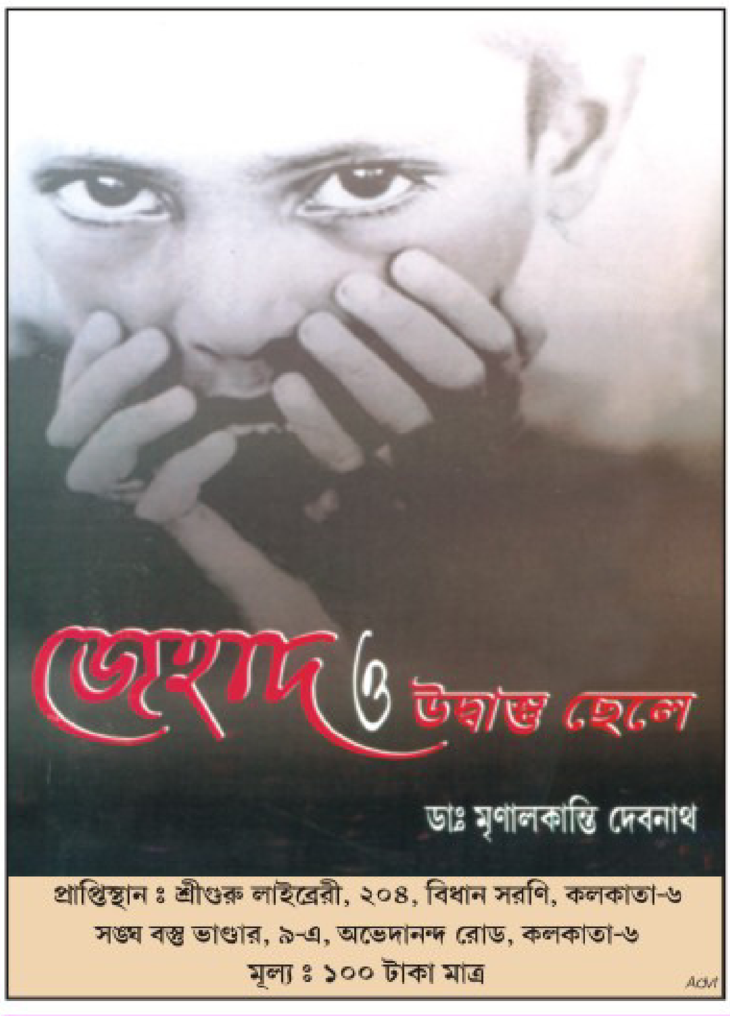

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com